ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)

নির্বাচনী ইশ্‌তেহার

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন, ২০২৪

প্রথম অংশ

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়েছে মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের এক দশকের শাসনে।

ভারতের সংবিধানের চারটি স্তম্ভ– ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সামাজিক ন্যায়বিচারকে ভেঙে ফেলার প্রক্রিয়াকে এখন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার অপব্যবহার করে, মোদী সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক-সাম্প্রদায়িক শাসন ভারতের শ্রমজীবী জনগণের অধিকারকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য ফ্যাসিবাদী পদ্ধতি ব্যবহার করেছে, ভারতকে বিশ্বের অন্যতম বৈষম্যযুক্ত সমাজে পরিণত করেছে, জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন করার জন্য বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক আদর্শ চাপিয়ে দিয়েছে।

অষ্টাদশ লোকসভার নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ এর ফলাফল নির্ধারণ করবে যে এই নির্বাচনে "আমরা জনগণ" আমাদের ভোটের মাধ্যমে ভারতের সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক চরিত্রকে রক্ষা করতে পারবো কিনা। এই লোকসভা নির্বাচন ভারতের সাধারণতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক চরিত্রকে একটি তীব্র অসহিষ্ণু, ঘৃণা ও হিংসাচালিত স্বৈরতান্ত্রিক এবং ফ্যাসিবাদী হিন্দুত্বের রাষ্ট্রে রূপান্তর করায় বিজেপি'র প্রচেষ্টার থেকে রক্ষা করার নির্বাচন- এই সম্পর্কে আমাদের কোনও ভুল করা উচিত হবে না। এটাই বিজেপি'র পরিচালক সংগঠন আরএসএস'র খোলাখুলিভাবে ঘোষিত লক্ষ্য, আরএসএস এখন দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে অভূতপূর্বভাবে প্রবেশ করেছে এবংভারতের শিরায় শিরায় সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

এর পাশাপাশি গত লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে বিগত পাঁচ বছরে, আমাদের দেশ শ্রমজীবী মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, আদিবাসী, দলিত, মহিলা, যুব এবং ছাত্রদের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের, প্রতিরোধের লড়াইয়েরও সাক্ষী থেকেছে। এই সংগ্রামগুলির মধ্যে অনেকগুলি, বিশেষ করে কৃষকদের ঐতিহাসিক সংগ্রাম প্রমাণ করেছে যে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হলে এই সরকারের শক্তি এবং দমন-পীড়নকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে ও পরাজিত করতে পারে। এই সময়ের মধ্যে আমরা সিপিআই(এম)'র নেতৃত্বে কেরালায় বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকার (এলডিএফ) দ্বারা বাস্তবায়িত বিকল্প নীতিগুলির সম্ভাবনাও দেখেছি যা আর্থিকভাবে শ্বাসরোধ করার সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গণমুখী নীতি রূপায়ণে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আলোকবর্তিকা।

সিপিআই(এম) ভারতের জনগণের সামনে তার ইশ্‌তেহার প্রকাশ করছে এই স্পষ্ট বোঝাপড়া থেকে যে বিজেপি এবং তার সহযোগীদের পরাজয় নিশ্চিত করা এই সময়ে প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের আবশ্যিক কর্তব্য। সিপিআই(এম) এই সম্মিলিত দায়িত্বকে শক্তিশালী করতে এবং কেন্দ্রে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে পার্টির সামর্থ্য অনুযায়ী সবকিছু করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর জন্য, এবং জনস্বার্থবাহী নীতি নিশ্চিত করার জন্য সংসদে সিপিআই(এম)'র শক্তিশালী উপস্থিতি জরুরি।

ইশ্‌তেহারের প্রথম অংশে, বর্তমানের প্রধান সমস্যাগুলির ওপর আলোকপাত করা হচ্ছে। দ্বিতীয় অংশে, বিকল্প নীতির জন্য সিপিআই(এম)'র দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হচ্ছে যা জনগণের বিভিন্ন অংশকে প্রভাবিত করতে পারে।

ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা করো

গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিগুলি বাদ দেওয়া হলে গণতন্ত্র নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা বিজেপি'র শাসনকালে ঘটছে।

সংবিধান প্রত্যেক নাগরিককে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়, এমনকি নাস্তিক হওয়ারও। সংবিধানে বলা আছে, এবং সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায়েও প্রতিফলিত হয়েছে যে রাষ্ট্র এবং সরকার কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের বলে চিহ্নিত হবে না, কোনো নির্দিষ্ট ধর্মকে প্রচার করবে না। ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে এই বাধ্যতামূলক বিচ্ছেদ কার্যত পরিত্যক্ত হয়েছে। অযোধ্যায় মন্দিরের উদ্বোধনে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার মৌলিক নীতির উপর একটি নির্মম আঘাত। এটাই একমাত্র উদাহরণ নয়। নতুন পার্লামেন্ট ভবন, বা কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা করিডোরের উদ্বোধনে মোদী হিন্দু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের যাজক হিসাবে অবতীর্ণ হয়ে সেগুলিকে রাষ্ট্র প্রযোজিত ঘটনায় পরিণত করেছেন। ইঙ্গিত স্পষ্ট, বিজেপি সরকারের অধীনে, ভারত ক্রমশ একটি মনুবাদী মতাদর্শের ভিত্তিতে হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে।

নির্বাচনের প্রাক্কালে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ২০১৯ এর বিধিপ্রকাশের বিজ্ঞপ্তি ভোটারদের মেরুকরণের জন্য একটি বিপজ্জনক পদক্ষেপ। সিপিআই(এম) এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলি এই আইনের তীব্র বিরোধিতা করেছে কারণ এটি নাগরিকত্বকে ধর্মের সাথে যুক্ত করার লক্ষ্যে পরিচালিত এবং তাই অত্যন্ত বৈষম্যমূলক। সিপিআই(এম)'র নেতৃত্বে কেরালার এলডিএফ সরকার দেশে প্রথম একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে ঘোষণা করে যে এটি কেরালায় রূপায়ণ করা হবে না। রাজ্য সরকারগুলির বিরোধিতাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নতুন বিধিতে নাগরিকত্ব নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত নিতে গঠিত প্যানেলে আমন্ত্রিত প্রতিনিধি ছাড়া রাজ্য সরকারগুলিকে প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এটা সংবিধানের ওপর আরেকটি আঘাত।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে মুসলমানদের লক্ষ্য করে ঘৃণা ও হিংসার ভয়ানক প্রচার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সশস্ত্র উন্মত্ত ভিড়কে সাম্প্রদায়িক হামলা চালাতে দেওয়া হচ্ছে। ২০২০ সালে দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ছিল একটি সংগঠিত ও পূর্বপরিকল্পিত

হামলা। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, বিজেপি'র মন্ত্রী এবং নেতারা যারা ঘৃণা ও হিংসা ছড়ানোর উসকানিমূলক বক্তৃতা দিয়েছিলেন তারা ছাড় পেয়েছেন, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলি সংখ্যালঘুদের আক্রমণ করার জন্য 'প্রাইভেট আর্মি'কে বৈধতা দিচ্ছে, এবং অনেক রাজ্য বুলডোজার রাজনীতির নীতি ব্যবহার করে বেআইনিভাবে অবৈধ নির্মাণের নামে মুসলিমদের বাড়িঘর এবং বাণিজ্যিক কাঠামো ভেঙে দিয়েছে। বিজেপি রাজ্য সরকারগুলি সাম্প্রদায়িক মেরুকরণকে তীক্ষ্ণ করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে গরু ও গবাদি পশুর সুরক্ষা, গবাদি পশুর ব্যবসা এবং মাংস বিক্রি, তথাকথিত লাভ জিহাদ, ইউনিফর্ম সিভিল কোড ইত্যাদি, যা নিয়মিতভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরপরাধ লোকদের লক্ষ্য করে, তাদের শারীরিকভাবে আক্রমণ করতে এবং আইনের নামে হেনস্তা করতে পরিচালিত হচ্ছে। তথাকথিত ধর্ম সংসদের নামে মুসলমানদের গণহত্যার জন্য বিপজ্জনকভাবে এই ধরনের ভয়ঙ্কর ঘৃণা ও হিংসার ক্রমবর্ধমান প্রচারকে স্বাভাবিক করে তোলা হয়েছে।

এই সময়ের মধ্যে খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাও তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলি ধর্মান্তর বিরোধিতার নামে দানবীয় আইন তৈরি করেছে। বিশেষ করে দরিদ্র আদিবাসী সম্প্রদায়কে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। মণিপুর হল বিজেপি'র ডবল ইঞ্জিন সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদী নীতির সৃষ্টি করা বিপর্যয়ের একটি মর্মান্তিক উদাহরণ যেখানে জাতিসত্তার পাশাপাশি তাদের ধর্মের কারণে আদিবাসীদের বিশেষভাবে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে, কারণ মণিপুরে সংখ্যাগরিষ্ঠরা খ্রিস্টান। বিজেপি'র বিভাজনমূলক রাজনীতি কীভাবে ভারতের এবং বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের অনন্য বৈচিত্র্য এবং বহুত্ববাদকে ধ্বংস করতে পারে তার সবচেয়ে জ্বলন্ত উদাহরণ হলো মণিপুর।

ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার নীতি ও তার অনুশীলনের দাবি সিপিআই(এম) যুক্তিসম্মতভাবেই করতে পারে। কোনও আপস না করে, কোনো দুর্বলতা ছাড়াই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং প্রান্তিকদের অধিকারের জন্য লড়াইয়ের পাশে দাঁড়ানোর গর্বিত রেকর্ড রয়েছে সিপিআই(এম)'র এবং একই সঙ্গে সংখ্যালঘু মৌলবাদের দৃঢ় বিরোধিতা এবং প্রতিরোধ করারও।

ধর্মকে রাজনীতি, রাষ্ট্র, সরকার এবং প্রশাসন থেকে আলাদা করার নীতি আঁকড়ে থেকে সিপিআই(এম) আপসহীন লড়াই করার অঙ্গীকার করছে। সিপিআই(এম) ঘৃণা ভাষণ এবং অপরাধের বিরুদ্ধে আইন তৈরির জন্য এবং সিএএ বাতিল করার জন্য লড়াইতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গণতন্ত্র রক্ষা করো

মোদী সরকারের একটি অঘোষিত নীতি রয়েছে যে সমস্ত বিরুদ্ধ মতকে তারা দেশবিরোধী অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করে এবং এইভাবে একটি গণতান্ত্রিক দেশের ভিত্তি

ভিন্নমতের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে। সরকার নির্বিচারে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (UAPA), জাতীয় নিরাপত্তা আইন (NSA) এবং প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) এর মতো কঠোর আইন ব্যবহার করে কয়েকশো মানুষকে কোনো অভিযোগ ছাড়াই আটক করেছে যার মধ্যে বিশিষ্ট এবং দায়বদ্ধ রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক কর্মীরাও রয়েছেন। তাঁদের জামিনের অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে কারণ তাঁরা মোদী সরকারের নীতির বিরোধিতা করেছেন। বিশেষ করে সাংবাদিক যারা নিরপেক্ষ প্রতিবেদনের কর্তব্য পালনের জন্য সরকারের কাছে আত্মসমর্পণে অস্বীকার করেছেন, তাঁরা আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছেন। এভাবে স্বাধীন মিডিয়ার মতো অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয়েছে, মিডিয়া এখন মোদী সরকারের বড় ব্যবসায়ী বন্ধুদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। শ্রমজীবী জনগণের গণসংগ্রাম সবচেয়ে বেশি নিপীড়নের সম্মুখীন হচ্ছে। এটা আগে কখনো শোনা যায়নি যে একটি নির্বাচিত সরকার ড্রোন ব্যবহার করে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারী কৃষকদের ওপর টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করেছে, মোদী সরকার তাদের দেশের শত্রু ধরে নিয়ে এই আচরণ করেছে।

গত পাঁচ বছরে, সংসদ নিজেই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কখনও কখনও পুরো অধিবেশনের জন্য বিরোধী সাংসদদের পাইকারিভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে, স্থায়ী কমিটির মতো সর্বদলীয় প্যানেলের মতামত ছাড়াই আইন পাসের বুলডোজার চালানো হয়েছে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আইন পাস করানো হয়েছে কোনো আলোচনা ছাড়াই।

উপরন্তু, নজরদারি ও ভারসাম্য রক্ষার জন্য সাংবিধানিকভাবে বাধ্যতামূলকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি– সংসদ, বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন ইত্যাদিকে গুরুতরভাবে অবনমিত করা হয়েছে। মহিলা কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশনের মতো গণসংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারের অধীনস্থ সংস্থায় পরিণত করা হয়েছে। সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই), এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এবং আয়কর বিভাগ (আইটি)'র মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক শাখা হিসাবে বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য হলো ক্ষমতাসীন দলে যোগদানের জন্য তাদের সন্ত্রস্ত করা, ভয় দেখানো, এবং যদি তারা সেই অনুযায়ী দলবদল করে তবে সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। বিজেপি'র স্লোগান হয়ে দাঁড়িয়েছে, 'হয় আমাদের সঙ্গে যোগ দাও, নয়তো জেলে যাও।'

বিভিন্ন সন্দেহজনক উপায়ে সঞ্চিত অর্থ শক্তির নির্লজ্জ ব্যবহার করে বড় আকারের ঘোড়া-কেনাবেচা এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। অনেক রাজ্যে যেখানে বিজেপি নির্বাচনে হেরেছে, তারা এই পদ্ধতিতে রাজ্য সরকার গঠন ও চালাতে সফল হয়েছে। এভাবে গণতন্ত্রকে উপহাস করা হচ্ছে এবং জনগণের নির্বাচনী রায়কে অস্বীকার করা হচ্ছে।

সম্প্রতি নির্বাচনী বন্ড কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে মামলায় সিপিআই(এম) আবেদনকারী ছিল। এরফলে রাজনৈতিক দুর্নীতিকে বৈধকরণে নির্বাচনী

বন্ডকে উপায় হিসাবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে সিপিআই(এম)'র শক্তিশালী এবং নীতিগত বিরোধিতা বৈধ বলে স্বীকৃত হয়েছে। শেষ অবধি, মোদী সরকার চেষ্টা চালিয়েছিল তার কর্পোরেট বন্ধুদের সাথে 'কুইড প্রো-কো'কে লুকানোর মাধ্যমে রাজনৈতিক দুর্নীতির প্রমাণ গোপন করার। বিজেপি তার বর্তমান নেতাদের হাত ধরে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

মোদী সরকার একটি কঠোর গোপন নজরদারি রাষ্ট্রের কাঠামো তৈরি করেছে যা সম্পূর্ণরূপে নাগরিকদের গোপনীয়তার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে। এটি শুধুমাত্র দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের নয়, হেফাজতে আটক যে কোনো ব্যক্তির বায়োমেট্রিক ডেটা সংগ্রহের জন্য ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষা আইন, ফৌজদারি কার্যবিধি শনাক্তকরণ আইন ইত্যাদির মতো কঠোর আইনে ব্যবস্থা তৈরি করেছে। এটি বিরোধী নেতা, সাংবাদিক এবং সমাজকর্মীদের বিরুদ্ধে কুখ্যাত ইজরায়েলি পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করেছে। নজরদারি শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুলিশী রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করা সংবিধান স্বীকৃত নাগরিকদের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তাকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে।

সিপিআই(এম)'র অবস্থান ইউএপিএ এবং পিএমএলএর মতো সমস্ত কঠোর আইন বাতিলের পক্ষে, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধিকার রক্ষা ও শক্তিশালী করার পদক্ষেপের পক্ষে।

অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষা করো

জনগণের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতি বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতি উঠে এসেছে বলে সরকার যে দাবি করছে তা আসলে বিশাল তথ্যের বিকৃতিকরণের ওপর ভিত্তি করে চালানো একটি মিথ্যা প্রচার। শুধু একটি উদাহরণই যথেষ্ট। এই বছর নমিনাল জিডিপি বৃদ্ধি ঘটেছে, যা ৯.১ শতাংশ। প্রকৃত বৃদ্ধির হারে পৌঁছানোর জন্য মুদ্রাস্ফীতি সূচককে ব্যবহার করতে হয়। যখন মূল্যবৃদ্ধির হার প্রায় ৬ শতাংশ এবং খাদ্যপণ্যে মূল্যবৃদ্ধি ১০ শতাংশের বেশি তখন সরকার অবমূল্যায়ন সূচক হিসাবে ১.৫ ব্যবহার করেছে। যদি মুদ্রাবৃদ্ধির হারের কাছাকাছি ৬-কে অবমূল্যায়ন সূচক হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে প্রকৃত বৃদ্ধির হার হবে প্রায় ৩ শতাংশ। কিন্তু সরকার এই ভয়াবহ বাস্তবতাকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। ভারতের মাথাপিছু জিডিপি'র হার জি-২০ দেশগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন।

মোদী সরকারের "মেড ইন ইন্ডিয়া" স্লোগানটি আসলে "লুট ইন ইন্ডিয়া" নীতি। মোদী শাসনের কর্পোরেট-সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক ক্রোনি পুঁজিবাদ এবং জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠনের আগল খুলে দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন হলো সরকারি টাকায় তৈরি পরিকাঠামোকে ধাপে ধাপে বেসরকারি মালিকদের কাছে হস্তান্তর। কোনো বিনিয়োগ ছাড়াই, বেসরকারি মালিকরা রাজস্ব আদায়ের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ পাচ্ছে। দেশের খনিজ সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ বেসরকারি ক্ষেত্রের লুটের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সুরক্ষামূলক

আইন সংশোধন করা হয়েছে যাতে বৃহৎ বনাঞ্চল সাফ করে এবং পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়ে, আদিবাসী এবং অন্যান্য অরণ্যে বসবাসকারীদের বাস্তুচ্যুত করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে মোদী সরকার ভারতীয় অর্থনীতির বিনিয়ন্ত্রণ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে, যা বিদেশি এবং দেশিয় উভয় কর্পোরেটদের ব্যাপকভাবে উপকৃত করেছে। ব্যাঙ্কে মানুষের সারা জীবনের সঞ্চয় লুট করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে সাঙ্গাৎদের। ২০১৪ সাল থেকে মোদী সরকার ১৭.৪৬ লক্ষ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব করেছে। কর্পোরেট এবং ধনীদের জন্য বিশাল কর ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এটি অর্থনৈতিক বৈষম্যকে তীব্রভাবে প্রসারিত করছে। অক্সফাম রিপোর্ট দেখিয়েছে যে ভারতের ৪০ শতাংশেরও বেশি সম্পদের মালিকানা জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশের হাতে। নিচের ৫০ শতাংশ মানুষের হাতে সামান্য ৩ শতাংশ সম্পদ। দেশের মোট বিলিওনিয়ারের সংখ্যা ২০২০ সালের ১০২ থেকে বেড়ে ১৬৯ হয়েছে ২০২৩ সালে।

অন্যদিকে, কর্পোরেট স্বার্থবাহী শ্রম কোড চাপিয়ে ভারতের শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন আক্রমণ নামানো হয়েছে যা তাদের অর্জিত অধিকারগুলি ছিনিয়ে নিচ্ছে। শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার মৌলিক অধিকারও মারাত্মক আক্রমণের মুখে।

সরকার প্রকৃতপক্ষে ভারতের কৃষকদের অধিকারের ওপর সর্বাত্মক আক্রমণের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রকে কর্পোরেটাইজ করার চেষ্টা করে অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বকে দুর্বল করছে। কৃষকদের ঐতিহাসিক এক বছরের সংগ্রামের মুখে, সরকার তার তিনটি কৃষক বিরোধী, ভোক্তা বিরোধী আইন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেও প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন না করে কৃষকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এটি আসলে ভারতের স্বনির্ভরতা এবং অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ণ করছে।

ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্র, তার প্রাকৃতিক সম্পদ, তার শ্রমশক্তি ও কৃষকদের অধিকারের সুরক্ষা ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব থাকতে পারে না।

সিপিআই(এম) ভারতের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষার নীতির প্রতি দায়বদ্ধ। পার্টি মনে করে যে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণকে অবশ্যই পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণের বিপরীত পদক্ষেপ নিতে হবে। সাধারণ সম্পদ কর এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পদের ওপরে কর সহ অতি ধনীদের ওপর কর বসাতে অবশ্যই আইন প্রণয়ন করতে হবে, শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় শ্রমিক স্বার্থবাহী আইন দিয়ে অবশ্যই শ্রম কোডগুলিকে প্রতিস্থাপন করতে হবে, স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এমএসপি'কে আইনি গ্যারান্টির আওতায় এনে ভারতের কৃষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে যার ওপরে খাদ্য নিরাপত্তা নির্ভর করে আছে।

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করো, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করো, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করো

কোভিড মহামারী ব্যবস্থাপনায় মোদী সরকারের অপরাধমূলক অপদার্থতা এবং এর ত্রুটিপূর্ণ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কারণে জনগণের মধ্যে দুর্ভোগ ও ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপকভাবে

বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, কেরালা একটি শক্তিশালী স্বাস্থ্য পরিষেবার বিকল্প দেখিয়েছে। আসলে বিমা ভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিষেবা মূলত বেসরকারিক্ষেত্রকে সাহায্য করে। পরিবর্তে চিকিৎসা পরিষেবা চাওয়া রোগীদের অধিকার নিশ্চিত করা ও সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার সমন্বয় ঘটানো উচিত।

মোদী সরকার তথাকথিত বহুমাত্রিক সূচক ব্যবহার করে ভারতের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যকে লুকানোর উপায় তৈরি করেছে যার মধ্যে রয়েছে জনধন অ্যাকাউন্ট, বাড়িতে শৌচালয় ইত্যাদি পরিমাপ। প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র পরিমাপের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক যেমন, বিশ্ব ক্ষুধা সূচক, জাতীয় নমুনা সমীক্ষা এবং পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা দেখিয়ে দিচ্ছে মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি, ক্ষুধা এবং বঞ্চনা তীব্র আকার নিয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের ৫টি সংস্থার একটি রিপোর্ট (২০২৩) দেখাচ্ছে যে ৭৪.১ শতাংশ ভারতীয়, আনুমানিক ১০ কোটি ৪৩ লক্ষ মানুষ ২০২১ সালে স্বাস্থ্যকর খাদ্য পায়নি।

মোদী সরকার এমন নীতি অনুসরণ করেছে যার কারণে অভূতপূর্ব মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে। পেট্রোলিয়াম পণ্যের শুল্ক বাড়িয়ে ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৩-২৪ সালের প্রথমার্ধের মধ্যে ২৮.৩৩ লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছে। এটি জনগণের উপার্জন থেকে একটি বিশাল পকেটমারি ছাড়া কিছুই নয়। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়েছে যা সাধারণ মানুষের জীবনকে, বিশেষ করে মহিলাদের জীবনকে যারা পরিবারের বেঁচে থাকার জন্য নিজেদের প্রয়োজনকে বিসর্জন দেয় তাঁদের ওপরে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে।

বিশেষ করে কেরালার এলডিএফ সরকারের মতো কিছু সরকারের শুল্ক কমানো এবং বর্ধিত গণবন্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মতো পদক্ষেপের পরিবর্তে মোদী সরকার আসলে খাদ্যের জন্য বাজেটের বরাদ্দ ব্যাপকভাবে হ্রাস করেছে এবং জনগণের জন্য বরাদ্দ খাদ্যশস্যের পরিমাণ কমিয়েছে।

একই সময়ে লেবার ফোর্স সমীক্ষা দেখিয়েছে যে ২০১৪ সাল থেকে গড় প্রকৃত মজুরি স্থবির হয়ে গেছে। তাই মধ্যবর্তী প্রকৃত মজুরি স্পষ্টতই হ্রাস পাচ্ছে যার ফলে মানুষ খরচ কম করতে বাধ্য হচ্ছে। ২০২৩ সালে ভারতের পরিবারগুলির সঞ্চয় গত ৪৭ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে (আরবিআই)। ফলে প্রয়োজন মেটানোর জন্য ধার নেওয়া বাড়ছে এবং পরিবারগুলি ঋণগ্রস্ততার দিকে যাচ্ছে। এর ফলে আভ্যন্তরীণ চাহিদা নিম্নমুখী হয়েছে, যার ফলস্বরূপ, উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে এবং তাই কর্মসংস্থান কমে যাচ্ছে। ভারতীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের চাবিকাঠি হল জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর নীতি।

সিপিআই(এম) জরুরি ভিত্তিতে পেট্রোলিয়াম পণ্যের ওপর শুল্কহ্রাস, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের নীতি এবং ৮১ কোটি মানুষের জন্য বিনামূল্যে ৫ কেজি করে খাদ্যশস্য বন্টন, ৫ কেজি করে ভরতুকিতে খাদ্যশস্য বন্টন (৩ টাকা/কেজি দরে চাল, ২ টাকা/কেজি দরে গম, ১টাকা/কেজি দরে দানাশস্য) ফিরিয়ে আনার দাবি করছে। সরকারি অর্থে একটি সর্বজনীন জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

বেকারি

দেশজুড়ে ব্যাপক বেকারিই মোদী সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। বছরে দু কোটি বেকারের কর্মসংস্থানের দাবি করেছিল এই সরকার। সেই গ্যারান্টির বাস্তবায়ন তো দূরের কথা, গত পাঁচ বছরে কর্মসংস্থান ক্রমশ কমে গেছে। গত একদশক জুড়ে ভারতে বেকারত্ব নতুন রেকর্ড ছুঁয়েছে। ২০২৩ সালে মোদী সরকার দাবি করেছিল বিগত ৬ বছরে নাকি বেকারি কমেছে– এমন ফাঁকা বুলি বাস্তব তথ্যের সাথে মেলে না। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমির (সিএমআইই)-র প্রতিবেদনে প্রকৃত অবস্থার কথা তুলে ধরে দেখানো হয়েছে গত বছর অবধি দেশে বেকারত্বের হার ৮.১ শতাংশ। ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের বেকারিকে যুব অংশের বেকারত্ব বলে, তার হার ছিল ২৩.২২ শতাংশ। স্নাতক স্তর পাশ করেছেন এমন অংশের মানুষের মধ্যে বেকারির হার ৪২ শতাংশ। গত বছরের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে চারটি বৃহৎ আইটি সংস্থা মোট ৬৫,০০০ কর্মীকে ছাঁটাই করেছে। কর্মরত মহিলারাই এর মধ্যে সংখ্যাগুরু, বেকারির কোপে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন গ্রামীণ এলাকার কর্মরত মহিলারাই।

দেশজুড়ে সরকারি ও সরকারি সহায়তা প্রাপ্ত বিভিন্ন দপ্তরে শূন্যপদের সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ। সরকার এসব জানে না এমন নয়, ইচ্ছাকৃত তারা এইসব শূন্যপদে নিয়োগ না করিয়ে ফেলে রেখে দিয়েছে। এই সরকারের আমলে শুধু যে কাজ পাওয়ার সুযোগ সংকুচিত হয়েছে তাই নয়, লাগামহীন কায়দায় ক্যাজুয়ালাইজেশন, কন্ট্র্যাকটরাইজেশন ও ঠিকাদারিভিত্তিক কাজের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যাবতীয় উৎপাদনী ক্ষেত্র (ম্যানুফ্যাকচারিং), রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ও বেসরকারি (পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টর) ক্ষেত্র এমনকি সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। এই কৌশলে কার্যত দেশের সার্বিক কর্মক্ষম মানবসম্পদ (ওয়ার্ক ফোর্স)-কেই বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এমনকি অগ্নিবীর প্রকল্পের নামে দেশের সেনাবাহিনীতেও ঠিকাদারি কায়দায় অস্থায়ী সেনাকর্মী নিয়োগের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

দেশজুড়ে গ্রামাঞ্চলে কাজ এবং রোজগার হারানোর ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে কোভিড পর্বে। দেশের শহরাঞ্চলে কাজ পাওয়ার ভয়ানক অভাবের প্রভাবে আজকের ভারতে কার্যত এক বিপরীত অভিবাসন চলছে। ব্যাপক অংশের মানুষ বেঁচে থাকতে গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। ২০২৩-২৪ পর্বে দেশজুড়ে মোট ৯.৮৪ কোটি পরিবার এমএন রেগা প্রকল্পে কাজ পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। এমন প্রকল্পের অন্তর্গত কাজ যে রীতিমত শ্রমসাধ্য সেকথা বলাই বাহুল্য, তা সত্ত্বেও এমনটাই ঘটছে মানে শহরে কাজ না পাওয়ার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরেই তারা এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে ও গরিব মানুষ মোদী সরকারের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছেন, বাজেটে এমএন রেগা প্রকল্পে সংস্থান ক্রমশ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কাজের অধিকারকে মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে সিপিআই(এম)। এর পাশাপাশি আমরা দাবি জানাচ্ছি যাবতীয় সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থায় সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগ সম্পূর্ণ করতে হবে। ক্ষুদ্র, কুটির শিল্পসহ

মাঝারি আকারের সমস্ত উৎপাদনী ক্ষেত্রকেই মজবুত করে তুলতে সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলি মজবুত হলেই কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। এমএন রেগায় বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে, অন্তত দ্বিগুণ। শহুরে বেকারদের সমস্যা সমাধানে কাজ পাওয়ার সুযোগকে সুনিশ্চিত করতে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের সাথেই বেকার ভাতা দিতে হবে। আজকের ভারতে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মূল কথা কর্মসংস্থানহীন বৃদ্ধি (জবলস গ্রোথ)। ভারতে কর্মক্ষম জনসংখ্যা অনেক। একে দুর্বলতা হিসাবে প্রতিপন্ন না করে আইনের ইতিবাচক সংশোধন মারফত পরিস্থিতির বদল ঘটাতে হবে।

শিক্ষায় বেসরকারিকরণ চলবে না, উচ্চশিক্ষার বেসরকারিকরণ বন্ধ করতে হবে

২০২০ সালে গৃহীত জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যত শিক্ষার অধিকারকে অস্বীকার করে প্রণীত আইনিবিধি। এই আইনে শিক্ষাকে পণ্যরূপে বিবেচনা করে তাকে বেচাকেনার পর্যায়ে টেনে আনা হয়েছে। পাঠ্যক্রম (সিলেবাস) ইত্যাদি নির্ধারণ প্রসঙ্গে রাজ্যের অধিকারকে কেড়ে নিয়ে গোটা দেশে এক অভিন্ন শিক্ষানীতির মাধ্যমে কার্যত শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রিকরণ ঘটানো হয়েছে। এর পাশাপশি চলেছে গৈরিকীকরণের ঢালাও বন্দোবস্ত। জিডিপি'র মাত্র তিন শতাংশই জনশিক্ষায় ব্যয়বরাদ্দ হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে। অথচ এই একই সরকারের আমলে শিক্ষার সুযোগ বাড়ানোর নামে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে মুনাফা লুটের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। দেশজুড়ে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক চাহিদার সুযোগ নিয়ে বিরাট ব্যবসা শুরু হয়েছে। পাঠ্যক্রমের ইচ্ছাকৃত রদবদল মারফত গোটা সিলেবাসের গৈরিকীকরণ চলছে। ইতিহাসের বিকৃতি, অবিজ্ঞান-অপবিজ্ঞান ইত্যাদিকে ব্যবহার করে যুক্তিহীনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। নিজেদের রাজ্যে শিক্ষাক্রম পরিচালনার বিষয়টিতে রাজ্য সরকারের সাংবিধানিক অধিকারকে অস্বীকার করে গোটা বিষয়টিকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ কেন্দ্রীভূত একটি ব্যবস্থায় পর্যবসিত করা হয়েছে। এমনকি উপাচার্য ও শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগেও তারা নিজেদের ক্ষমতাকে একচ্ছত্র করতে চাইছে। সবচেয়ে জঘন্য বিষয় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য সমস্ত পদে এহেন নিয়োগে তারা কোনওরকম মেধাতালিকাকেই আমল দিতে চায় না।

জিডিপি'র অন্তত ছয় শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ হিসাবে বাজেটে নির্ধারিত হতে হবে। এটাই সিপিআই(এম)-র দাবি। শিক্ষার বেসরকারিকরণ, কেন্দ্রীভূত করার নামে পণ্যায়ন এবং সাম্প্রদায়িকীকরণ করা চলবে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সুরক্ষিত রাখতে হবে, রাজ্যের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষিত রাখতে হবে।

সাংবিধানিক নির্দেশের ভিত্তিতে নির্ধারিত রাজ্যসমূহের অধিকারগুলিকে খর্ব করা ও অস্বীকার করার প্রশ্নে মোদী সরকারের মনোভাব স্পষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে দুর্বল করে এরা চায় এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রণয়ন। মোদী সরকারের আমলে সেই এককেন্দ্রিক

শাসনের রূপ ক্রমশ সার্বিক চেহারায় সামনে এসেছে। দেশ পরিচালনায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জনশিক্ষা সম্পর্কিত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যাবতীয় ক্ষেত্রই তারা নিজেদের কব্জায় নিয়ে আসতে চাইছে। সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচিত রাজ্য সরকারগুলির উপর সরাসরি আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। এদের নিশানায় রয়েছে অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি। রাজ্যপাল ও লেফটেন্যান্ট গভর্নরদের কাজে লাগিয়ে যাবতীয় সাংবিধানিক রীতিনীতিকেই অস্বীকার করা হচ্ছে। যে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় নেই সেখানেই রাজ্যপালদের মাধ্যমে সরকারি কাজে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই একাধিক রাজ্য সরকার (অ-বিজেপি) সুপ্রিম কোর্টে এমন পরিস্থিতির বিরুদ্ধে আপিল করেছে।

কেরালা সরকার জনস্বার্থে বিকল্প নীতি প্রণয়ন করতে চায়। যাতে তারা এই কাজে সফল না হতে পারে তাই তাদের অর্থনৈতিকভাবে হাত-পা বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

সংবিধানের অন্তর্গত কিছু অধিকার রাজ্য ও কেন্দ্রের যৌথ তালিকাভুক্ত বিষয় বলে নির্ধারিত। এমন অবস্থায় মোদী সরকার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে রাজ্য সরকারের যৌথ অধিকারকে খর্ব করে দেওয়া যায় এমনকি সম্ভব হলে অস্বীকারও করা যায়।

আমাদের দেশে জাতীয় ভাষা শুধু হিন্দি নয়। সেই তালিকায় আরো অন্যান্য ভাষা আছে। সংবিধানের অষ্টম তফশিল অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন অংশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট অধিকার রাজ্য সরকারেরই অধীনস্থ বিষয়। মোদী সরকার ক্রমাগত সমস্ত ক্ষেত্রে হিন্দি ভাষার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। এমন চাপ আসলে ঘুরপথে রাজ্যের অধিকার কেড়ে নিয়ে তার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

জাতীয় আর্থিক তহবিলে সকলের অধিকার সুরক্ষিত রাখার প্রসঙ্গে রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে যথেচ্ছ কায়দায় সংকুচিত করা হচ্ছে। জিএসটি বাবদ রাজ্যগুলির ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য ছিল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই ক্ষতি পূরণের বকেয়া না চুকিয়ে এখন মোদী সরকার সেই মেয়াদ বৃদ্ধি করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আদায়কৃত কর মারফত গড়ে তোলা তহবিলে রাজ্যগুলির ন্যায্য পাওনাকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় রাজস্ব তহবিলে রাজ্যের প্রাপ্যের পরিমাণ ৪২ শতাংশ, অথচ তাদের দেওয়া হচ্ছে মাত্র ৩২ শতাংশ।

ফিসক্যাল রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট আইন পাস করানো হয়েছে। এর সুবাদে রাজ্যগুলিকে কিছুতেই একটি নির্দিষ্ট মাত্রার চাইতে বেশি আর্থিক বরাদ্দ প্রয়োজন এমন কোনো জরুরি আর্থিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে দেওয়া হচ্ছে না। একই কায়দায় কেন্দ্রীয় অর্থ তহবিল থেকেও রাজ্যগুলি কোনোরকম বর্ধিত ঋণ আদায় করতে পারছে না।

মোদী সরকারের আমলে রাজ্যগুলির যে সকল সাংবিধানিক অধিকার অস্বীকৃত হচ্ছে সে সমস্ত অধিকারী যথাযথ রূপে কার্যকর করতে হবে– সিপিআই(এম) এই দাবির পক্ষে লড়াই করছে। আমরা চাই কর বাবদ আদায়কৃত কেন্দ্রীয় অর্থ তহবিলের অর্ধেক (৫০ শতাংশ) রাজ্যের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হোক। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত বিবিধ সারচার্জ এবং সেসকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পার্টি দাবি জানাচ্ছে

রাজ্যপাল নিয়োগের জন্য তিনজন বিশিষ্ট সদস্যের প্যানেল নির্ধারিত হোক। এই তিনজনের নামের প্রস্তাব করবেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তার থেকেই একজনকে বেছে নেওয়া হবে। এভাবেই ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণকে রুখে দিয়ে রাজ্যের সাংবিধানিক অধিকারকে সুনিশ্চিত রাখা যায়।

সামাজিক ন্যায়

ভারতের সংবিধানে সকলের জন্য সমতার অধিকার সংক্রান্ত যে নিশ্চয়তা রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমশ তার থেকে সরে আসছে। এরফলে সামাজিক নিপীড়ন ও বঞ্চনার শিকার হওয়া অংশের মানুষজন ক্রমশ বৃহত্তর অন্যায় ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন।

বিজেপি সরকার মনুবাদী মতাদর্শে চলছে। গত ১০ বছরে সরকারের এখানে অবস্থানের জন্যই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার উপর নিরন্তর আক্রমণ নেমে এসেছে। ভারতের সংবিধানের মূল ভাবনায় ছিল ধীরে ধীরে জাতিভেদ প্রথার অবলুপ্তি ঘটানো। এর একেবারেই বিপরীত পথে এগিয়ে মোদী সরকারের আমলে জঘন্য কৌশলে জাতিভেদ ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষকে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। এসবই করা হয়েছে সংকীর্ণ রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য। জাতিভেদের পিরামিড সম ও অসম ব্যবস্থাকে আরো মজবুত করতেই এমনটা ঘটেছে। সরকারি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় তফশিলিজাতি ও উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত শূন্যপদে নিয়োগ আটকে রাখা হয়েছে। আউটসোর্সিং ও বেসরকারিকরণের জোড়া নীতির প্রয়োগে কাজের সুযোগ ক্রমশ কমেছে। জরুরি ছিল বেসরকারি ক্ষেত্রেও কাজের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ঐ নীতিকে আরও প্রশস্ত ও প্রয়োগ করা, যে কাজ করতে অস্বীকার করা হচ্ছে। অথচ এগুলিই সাংবিধানিক গ্যারান্টি ছিল। তফশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত শিক্ষার্থীদের ন্যায্য স্কলারশিপ পাওয়া ও আরো বৃদ্ধির প্রসঙ্গে বিপুল বকেয়া ফেলে রাখা হয়েছে। আদিবাসী মানুষের সাংবিধানিক ও আইনি অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, নিজেদের ভিটে মাটি থেকে তাদের উচ্ছেদ হতে হচ্ছে। স্বেচ্ছাচারী সরকারের হাতে তারা নিপীড়িত হচ্ছেন।

বিজেপি শাসিত রাজ্যে দলিতদের উপর আক্রমণ ও নিপীড়নের ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। সাংবিধানিক ও আইনি বহুবিধ অধিকারকে অস্বীকার করার পাশাপাশি গ্রামসভার কাজকর্মকে সংকুচিত করার ফলে আদিবাসীরা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন। এই সরকারের আমলে বনজঙ্গলকে ক্রমশ বেসরকারি মালিকানার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, এরই প্রভাবে আদিবাসীরা নিজেদের এলাকা থেকে উচ্ছেদ হচ্ছেন। এই সরকারের আমলে ক্রমাগত চেষ্টা চলছে যাতে আদিবাসী এমনকি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী আদিবাসীদেরও হিন্দু পরিচিতির আওতাভুক্ত করে নেওয়া যায়।

মহিলারাও এই সরকারের কৃতকর্মে প্রতারিত হয়েছেন। মোদী সরকারের আমলে মহিলা সংরক্ষণ আইনকে জনগণনা ও ডিলিমিটেশনের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এই কারণেই মহিলা আসন সংরক্ষণের বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক সংকটের পরিস্থিতিতে সবচেয়ে দুর্ভোগে পড়েছেন মহিলারাই। তারা কাজ হারিয়েছেন, রোজগার

হারিয়েছেন, বেঁচে থাকতে ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছেন।

দলিত ও আদিবাসী মহিলারা তিন ধরনের নিপীড়নের শিকার। জাতিভেদ, লিঙ্গবৈষম্য ও শ্রেণিশোষণ। গত ১০ বছরে মহিলাদের উপরে যৌন নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৮ শতাংশ। পশ্চাদপদ মনুবাদী সংস্কৃতির প্রভাবে সমাজে পিতৃতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক ও জাতিবিদ্বেষের পরিপূর্ণ বিভিন্ন ধ্যানধারণাকে সমর্থন যোগানো হচ্ছে। বিলকিস বানোর ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে মহিলাদের ওপর যৌন নির্যাতনের বিচারকে কীভাবে সাম্প্রদায়িক চেহারা দেওয়া হচ্ছে।

এসবের সাথেই বিজেপি শাসিত রাজ্যে মহিলাদের উপরে নির্যাতন ও নিপীড়নের বিভিন্ন ঘটনায় দেখা যাচ্ছে ঐ সকল অপরাধে অভিযুক্তদের বিভিন্ন কায়দায় সহায়তা যুগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হাথরসের ঘটনা আরো একবার সেই উদাহরণ সামনে টেনে এনেছে।

সরকারি, রাষ্ট্রায়ত্ত যাবতীয় ক্ষেত্রের পাশাপাশি বেসরকারি ক্ষেত্রেও চাকরিতে সংরক্ষণের নীতি প্রণয়ন করতে হবে বলে দাবি জানাচ্ছে সিপিআই(এম)। সাংস্কৃতিক আধিপত্যের অবসানে আদিবাসীদের নিজস্ব জীবনযাত্রাকে সুরক্ষিত রাখতে তাদের সাংবিধানিক ও আইনি অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে। ভারতে বিভিন্ন অনগ্রসর অংশের মানুষদের প্রকৃত অবস্থা জানতে জরুরি হল জাতিভিত্তিক জনগণনার কাজকে শেষ করা– অথচ ২০২১ সাল থেকে সাধারণ জাতীয় জনগণনার কাজ বকেয়া পড়ে রয়েছে। আইনসভায় এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের আসন সংরক্ষণের ঘোষণা অবিলম্বে করতে হবে। এতে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের ঘটনায় ন্যায় সুনিশ্চিত করার সম্ভাবনা মজবুত হবে।

দুর্নীতিকে বৈধতা দেওয়ার প্রসঙ্গে

গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারংবার দাবি করে এসেছেন যে বিজেপি দুর্নীতিমুক্ত সরকার পরিচালনা করছে। তারা নাকি দুর্নীতির প্রসঙ্গে আপসহীন (জিরো টলারেন্স) নীতি মেনে চলেন। যদিও তথ্য (রেকর্ড)-এর ঠিক উল্টো চিত্রই তুলে ধরছে। আগেকার অবস্থার চাইতে মোদী সরকারের আমলে সংঘটিত দুর্নীতির কেবল একটাই পার্থক্য। এই সরকার দুর্নীতিকে বৈধ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিয়েছে এবং তার পরিমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সীমাহীন। নির্বাচনী বন্ধ হোক বা পি এম কেয়ার্স ফান্ড সবটাই পাহাড় প্রমাণ ও নজিরবিহীন দুর্নীতিরই উদাহরণ।

দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সুবাদে ইলেক্টোরাল বন্ড যে একটি আগাগোড়া অসংবিধানিক বন্দোবস্ত তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। একইসাথে কোর্টের রায়ের কারণেই কারা সেই বন্ড কিনেছে এবং কাদের তহবিলে সেই অর্থ ঢুকেছে সবটাই এখন জলের মতো পরিষ্কার।

নির্বাচনী বন্ড বাবদ বিজেপি পেয়েছে ৮২৫২ কোটি টাকা। বন্ড বাবদ মোট যত টাকার সাহায্য এসেছে তার অর্ধেকই গেছে বিজেপি'র হাতে। কর্পোরেটের নিংড়ে নিয়ে এই টাকা বের করে আনা হয়েছে, আইনের পরিভাষায় এমন বন্দোবস্তের নাম

ক্যুইডপ্রোক্যুও। কার্যত লাগামহীন ঘুষ নেওয়ার আইনি ব্যবস্থাই হল নির্বাচনী বন্ড। এরই পাশাপাশি আরেক অপকৌশল প্রয়োগ হয়েছে। আয়কর দপ্তর, ইডি, সিবিআইদের মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে কাজে লাগিয়ে জবরদস্তি (ভয় দেখিয়ে) টাকা আদায় করা হয়েছে। এখানেও বন্দোবস্তে সবচেয়ে বেশি সুবিধা হয়েছে বিপুল অংকের টাকার রাহাজানি করা। এমন অনেক ব্যবসায়ী সংস্থাই দেখা যাচ্ছে মোট যত টাকার বন্ড কিনেছে তাদের মুনাফার পরিমাণ তার চাইতে অনেক অনেক কম। রাজনৈতিক দলের তহবিলে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে অর্থসাহায্যের স্বতঃস্ফূর্ত বন্দোবস্তের নাম করে বিজেপি কার্যত ঘুষ মারফতও জবরদস্তি টাকা আদায়ের এক আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থাকে আইনি বৈধতা দিয়েছিল।

সিপিআই(এম)-ই একমাত্র জাতীয় রাজনৈতিক দল যারা প্রথমদিন থেকে নির্বাচনী বন্ডের বিরোধিতা করেছিল। আমাদের পার্টি এমন বন্দোবস্তের মাধ্যমে কোনরকম অর্থসাহায্য গ্রহণ করতে সরাসরি অস্বীকার করেছিল। সেই কারণেই এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের মামলা করার হিম্মত একমাত্র আমাদেরই ছিল।

২০১৩ থেকে ২০২৩ অবধি নির্বাচনী বন্ড ছাড়াও মোট যত টাকা রাজনৈতিক দলগুলি তহবিলে গেছে (প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী) তার ৫০ শতাংশই একা বিজেপি-ই পেয়েছে। অর্থমূল্যে বিজেপি'র প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ (বন্ড বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ছাড়া) ৭৭২৬ কোটি টাকা।

দেশের নির্বাচনী রীতিনীতিকে স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট রাখার দাবিতে সিপিআই(এম) প্রথম থেকেই সোচ্চার থেকেছে। আমরা মনে করি কর্পোরেটদের তরফে মেলা অর্থ সাহায্য সরাসরি রাষ্ট্রীয় (জাতীয়) তহবিলে যাওয়া উচিত। একটি জাতীয় সাধারণ নির্বাচনী তহবিল গড়ে তুলে সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের তহবিলে কর্পোরেটদের অর্থ সাহায্য দেওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। জাতীয় তহবিল মারফত বিভিন্ন দলের জন্য বরাদ্দ অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থাই সঠিক ও ন্যায্য বন্দোবস্ত।

জম্মু ও কাশ্মীর

২০১৯ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতাসীন হয়েই মোদী সরকার সবার আগে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল ঘোষণা করেছিল। তার সাথেই জম্মু ও কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত দুটি অঞ্চলে রূপান্তরিত করা হয়। ৩৭০ ধারার পাশাপাশি সংবিধানেরই ৩৫এ ধারাটিও বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর ছিল ভারতের একমাত্র রাজ্য যেখানে মুসলমান জনসাধারণই ছিলেন সংখ্যাগুরু। এই রাজ্যের জন্য সংবিধান স্বীকৃত বিশেষ মর্যাদাকে বিলোপ করে দিলে ভারতে তার অন্তর্ভুক্তির বুনিয়াদকেই অস্বীকার করা হয়, এটি আরএসএস-র হিন্দুত্বের কর্মসূচির দীর্ঘদিনের লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় সরকার সেটাই করেছে। এমন ঘোষণার পর এতদিন কেটে গেলেও সে রাজ্যের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বসহ অন্যান্যদের কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। তার সাথে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে একাধিক দানবীয় নিষেধাজ্ঞা। ইন্টারনেটের মতো জরুরি পরিষেবা কেউ বন্ধ করার ন্যায় বহু ঘটনা ঘটেছে।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করার পর থেকেই জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় জনসংখ্যাভিত্তিক এতদিনকার পরিস্থিতিকে বদলানোর সার্বিক চেষ্টা চলছে। সেই উদ্দেশ্যেই ডিলিমিটেশন কমিশন গঠন করা হয়েছে। স্থায়ী বাসিন্দাদের ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করতে জমির উপরে তাদের অধিকার ও ডোমিসাইল স্ট্যাটাসকে অস্বীকার করা হচ্ছে। রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে বারে বারে পিছিয়ে দেওয়া চলছে।

জম্মু ও কাশ্মীরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আতঙ্কবাদ বিরোধী লড়াইকে মজবুত করতে সরকারের পক্ষে বিরাট সব দাবি পেশ করা হয়েছিল। এখন তথ্য যা তুলে ধরছে তাতে স্পষ্ট জম্মুতে আতঙ্কবাদী কাজকর্ম ও অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে ৭১ শতাংশ। ২০১৯ থেকে ২০২২-এর মধ্যবর্তী সময়ে জম্মু ও কাশ্মীর মিলিয়ে প্রতি বছর হামলার ঘটনা ঘটেছে গড়ে প্রায় ১২৫ থেকে ১৫০টি। এনকাউন্টারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ১০০'র বেশি। এখন ওখানকার অর্থনৈতিক সংকট এমনই যাতে বেকারির জাতীয় গড়ের চাইতে ঐ রাজ্যের বেকারত্বের হার তিন গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের রায়

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নেওয়া, সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারা বাতিলের সরকারি ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছিল। কোর্টের রায় যা হয়েছে তাতে আমাদের দেশের কাঠামো প্রসঙ্গে সংবিধানে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা বলা হয়েছে তা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হবে। সুপ্রিম কোর্টের রায় ভারতে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে ৩৭০ ধারার গুরুত্বকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরে জম্মু ও কাশ্মীরের আলাদা করে সার্বভৌমত্বের আর কোনো গুরুত্বই নেই। এমন রায়ের সুবাদে সারা দেশের যেকোনো রাজ্যেই যেকোনো সময় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হতে পারে। নিজেদের ইচ্ছেমতো যেকোনো রাজ্যের সীমানার রদবদল করা যেতে পারে। নির্বাচিত বিধানসভাকে অকার্যকরী অবস্থায় ফেলে রেখে রাজ্যপাল মারফত কেন্দ্রীয় শাসন জারি করাও তাকে চালিয়ে যাওয়াও সম্ভব।

জম্মু ও কাশ্মীরের প্রসঙ্গে ৩৭০ ধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্যত সে রাজ্যের মানুষের স্বায়ত্ব শাসনের প্রশ্ন। সিপিআই(এম) সেই অধিকারের পক্ষেই রয়েছে। আমরা দাবি জানাচ্ছি অবিলম্বে জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা নির্বাচনের কাজ শেষ করে পুনরায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

দেশের উত্তর-পূর্ব অংশের পরিস্থিতি প্রসঙ্গে

২০২৩ সালের মে মাস থেকে মণিপুরে জাতি দাঙ্গার পরিস্থিতি চলছে। কয়েকশো মানুষ ইতিমধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন, কয়েক হাজার মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন। মণিপুরে জাতি দাঙ্গার পরিস্থিতি ভয়ানক চেহারা নিয়েছে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রচার চলছে এবং ব্যাপক হিংসার ঘটনা ঘটে চলেছে, নৃশংস দলবদ্ধ ধর্ষণ তার একটি উদাহরণ। এসব কিছুর জন্য দায়ী মণিপুরের বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ধারাবাহিক মিথ্যাপ্রচার। তারা প্রথম থেকে প্রচার চালিয়েছে এই বলে যে আসামসহ উত্তর-পূর্বের সমস্ত রাজ্যে বিদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের দেশে ঢুকে সমস্ত কিছু দখল করছে। এমন ভয়ানক পরিস্থিতি সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার মণিপুরের ঘটনায় হস্তক্ষেপ করতে সরাসরি অস্বীকার করেছে। এই প্রসঙ্গে দেশের প্রধানমন্ত্রী একটি শব্দ উচ্চারণ করেননি। বোঝা যায় ডবল ইঞ্জিন সরকার বলে তারা যে প্রচার চালায় তা আসলে একেবারেই অকেজো। নিজেদের লোক বলে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীকে ঘটনার দায় থেকে মুক্ত রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার যে ভূমিকা নিয়েছে তারই ফলে সে রাজ্যে জাতি বিদ্বেষ ও হিংসার ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মণিপুরে মেতেই ও কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে হানাহানির ঘটনা ঘটছে তার একটি বিপদ হলো যেকোনো মুহূর্তে আশেপাশের রাজ্যগুলিতে বিশেষ করে মিজোরাম ও মেঘালয়ে অশান্তি ছড়িয়ে পড়তে পারে। দেশের উত্তর-পূর্ব অংশের রাজ্যগুলিতে মেরুকরণ ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। আসামে পরিস্থিতি এমন ভয়ানক চাপা উত্তেজনার আকার নিয়েছে যা যেকোনো মুহূর্তে সামান্য অগ্নিসংযোগেই ফেটে পড়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। মনে রাখতে হবে আসাম ভারতের একটি প্রান্তিক রাজ্য। এর সীমানা ঘেঁষে রয়েছে অন্য একটি দেশ, মায়ানমার। সেই দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই উপলব্ধি করতে হবে আসামের বর্তমান পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে এবং আগামীদিনে সম্ভাব্য বিপদের সংকেত দিচ্ছে।

বৈদেশিক নীতি

ভারতের স্বাধীন বিদেশ নীতি বাতিল হওয়ার প্রসঙ্গে : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক পরিকল্পনার সমীপে এই বিজেপি সরকার সরাসরি আত্মসমর্পণ করেছে। সারা বিশ্বে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যাবতীয় কৌশলকে মজবুত করতে বিজেপি সরকার সহায়তা যোগাচ্ছে। প্যালেস্তাইনের মানুষের উপর যে বীভৎস আক্রমণ চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে শর্তহীন যুদ্ধবিরতির দাবি জানাতে অস্বীকার করে বিজেপি সরকার নিজেদের নির্লজ্জ অবস্থানটি স্পষ্ট করে দিয়েছে। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনপ্রাপ্ত জায়নবাদী সরকারের পক্ষ নিয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে ভারত সর্বদা প্যালেস্তাইনের মানুষের ন্যায্য অধিকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আজকের ভারত সরকার ইজরায়েলের সাথে সমরাস্ত্র কেনার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, এমন কাজ আমাদের দেশের ঐতিহ্যে একটি কালো দাগ বিশেষ।

ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। সেই উদ্দেশ্যেই তারা ক্রমশ ভারতকে নিজেদের অধস্তন কূটনৈতিক সঙ্গীতে পর্যবসিত করছে। ইতিমধ্যে ভারত সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক ও সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। কোয়াড গঠন করা হয়েছে। কার্যত এটি হলো ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের অঞ্চলে একটি সক্রিয় কূটনৈতিক ও সামরিক জোট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও ইজরায়েল– এই ত্রিমুখী অক্ষশক্তি ক্রমশ মজবুত হয়ে উঠছে।

বিশ্বজোড়া জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে ভারত বরাবরই নেতৃত্বের অবস্থানে থেকেছে। নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে আমাদের দেশ নাম (নন অ্যালায়েন্ড মুভমেন্ট) সামিটের একটিও সভায় উপস্থিত হয়নি। এই প্রথম ভারতের কোনো প্রধানমন্ত্রী প্যালেস্তাইন সফর না করেই কেবলমাত্র ইজরায়েল ভ্রমণ করেছেন।

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের কাজকর্ম গুরুতর প্রভাব ফেলছে।

সিপিআই(এম) মনে করে জোটনিরপেক্ষতা বজায় রাখাই ভারতের জাতীয় স্বার্থে সবচেয়ে সঠিক রাজনৈতিক অবস্থান। প্রতিবেশী সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে ভারতের জাতীয় সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করায় ঐ নীতির কোনো বিকল্প নেই।

দেশের সংবিধান, গণতান্ত্রিক কাঠামোকে সুরক্ষিত রাখা এবং জনস্বার্থে আরো উন্নতরূপে কার্যকরী হওয়া প্রসঙ্গে

আজকের পরিস্থিতিতে চেতনায় দেশপ্রেম আছে এমন প্রত্যেক ভারতীয়ই দেশের সংবিধানস্বীকৃত শাসন প্রণালীর পক্ষে দাঁড়াবেন। আজকের ভারতে জনসাধারণের জীবনমান অভূতপূর্ব দুর্দশায় আক্রান্ত। একদিকে চলছে লুটেরা পুঁজিবাদের দাপট আরেকদিকে রয়েছে ক্ষমতাসীন কর্পোরেট পুঁজি ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আঁতাত। এরাই আজ দেশ পরিচালনার নীতি নির্ধারক শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন পরিস্থিতির বদল ঘটানোই লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য পূরণের জন্য দরকার জনস্বার্থে গৃহীত নীতিসমূহ। সেইসব বিকল্প নীতিকে যথাযথরূপে প্রণয়ন করাও অবশ্য কর্তব্য। আমাদের সংবিধান আক্রান্ত। কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতাসীন থাকার সুবাদে এবং প্রশাসনের উপরে নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম রাখার জোরে আরএসএস-বিজেপি ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সাধারণতান্ত্রিক কাঠামোকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার যাবতীয় পরিসর থেকে বিজেপি-কে ক্ষমতাচ্যুত করাই দেশের সাংবিধানিক শাসন কাঠামোকে সুরক্ষিত রাখতে একমাত্র উপায়। একইভাবে জনস্বার্থে যেকোনো বিকল্প নীতির যথাযথ প্রয়োগ কেবল তখনই করা সম্ভব যদি বিজেপি সরকার ক্ষমতায় না থাকে।

ইশ্‌তেহারের পরবর্তী অংশে আমরা সেই সকল বিকল্প নীতিসমূহের উল্লেখ করেছি।

ভারতের সংবিধান স্বীকৃত সাধারণতন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখতে, তাকে আরও মজবুত করতে এবং মৌলিকভাবে জনসাধারণের স্বার্থকে কেন্দ্র করে নীতিগ্রহণ ও প্রণয়নকে বাস্তবায়িত করতে আগামী অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ও তাদের সহযোগী রাজনৈতিক দলসমূহকে পরাস্ত করতেই হবে, একথা বলাই বাহুল্য।

ভারতীয় নির্বাচকমন্ডলীর সমীপে সিপিআই(এম)-র আবেদন:

১। বিজেপি ও তার সহযোগীদের পরাস্ত করুন।

২। লোকসভায় সিপিআই(এম) সহ বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি করুন।

৩। কেন্দ্রে একটি ধর্মনিরপেক্ষ বিকল্প সরকার গড়ে তোলা সুনিশ্চিত করুন।

দ্বিতীয় অংশ
বিকল্প নীতিসমূহ

মূল বিষয়গুলি

সিপিআই(এম) যে বিকল্প নীতিসমূহ রূপায়ণ করতে চায় তার মূল বিষয়

- সংবিধানে বর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ও গণতান্ত্রিক নীতি রক্ষা করা।
- উৎপাদন খরচের থেকে অন্তত ৫০ শতাংশ বেশি ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ফসল বিক্রির কৃষকদের অধিকারকে প্রয়োগ করা।
- শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম ২৬ হাজার টাকা মজুরিকে বিধিবদ্ধ রূপ দেওয়া, ক্রেতা মূল্যসূচকের সঙ্গে মজুরি সংযুক্ত থাকবে।
- সার্বজনীন গণবণ্টন ব্যবস্থায় মাথাপিছু ১০ কেজি খাদশস্য– ৫ কেজি বিনামূল্যে, ৫ কেজি ভরতুকি প্রাপ্ত দামে।
- বিনামূল্যে চিকিৎসার অধিকার, বেসরকারি বিমা ভিত্তিক চিকিৎসা কাঠামোর অবসান, স্বাস্থ্যখাতে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৫ শতাংশ সরকারি বরাদ্দ।
- জনগণনা বা ডিলিমিটেশনের সঙ্গে যুক্ত না করে অবিলম্বে সংসদে এবং রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ সংরক্ষণ চালু করো, মহিলা ও শিশুদের ওপরে নির্যাতন বন্ধে সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করো।
- জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ বাতিল করো। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ– প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা, তারই সঙ্গে শিক্ষার গুণগত মানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষাখাতে জিডিপি'র ৬ শতাংশ সরকারি বরাদ্দ, শিক্ষাব্যবস্থার সাম্প্রদায়িকীকরণ প্রতিহত করে গণতান্ত্রিক চরিত্র নিশ্চিত করা।
- কাজের অধিকারকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি, কর্মহীনদের জন্য বেকার ভাতা।
- সমস্ত প্রবীণ নাগরিকের জন্য বার্ধক্য পেনশন চালু করা যা ন্যূনতম বেতনের অর্ধেক বা ৬ হাজার টাকা, যেটি বেশি তা হবে।
- রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণ বন্ধ করা, প্রতিরক্ষা, বিদ্যুৎ, রেল, মৌলিক পরিষেবা ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা।
- বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি, আদিবাসী, ওবিসি, প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষণ চালু কর।
- ধনীদের ওপরে এবং কর্পোরেটের মুনাফার ওপরে কর বৃদ্ধি, অতি ধনীদের জন্য সম্পদ কর ফিরিয়ে আনা, উত্তরাধিকার কর চালু করা, দীর্ঘমেয়াদী মূলধনী লভ্যাংশে কর পুনরায় চালু করা।
- আংশিক তালিকার ভিত্তিতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব চালু করে নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার, নির্বাচনী ব্যয়ের জন্য সামগ্রী দিয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যয় চালু করা।

সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষা

সিপিআই(এম) নিশ্চিত করবে :

সংবিধান, গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক অধিকার পদদলিত করছে যে স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামো তা বাতিল করা হবে।

এর জন্য প্রয়োজন

- উচ্চ বিচারালয়, নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা/স্বশাসন নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া।
- বেআইনি কার্যকলাপ মোকাবিলা আইন (ইউএপিএ), জাতীয় নিরাপত্তা আইন (এনএসএ), সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন (আফস্পা) বাতিল করা।
- পিএমএল এ আইন বাতিল করা, ইডি-র আইন প্রয়োগের ক্ষমতা রদ করা।
- তিন ক্রিমিনাল কোডের পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা ও সংশোধন যাতে গণতন্ত্রবিরোধী ধারা ও পুলিশের ক্ষমতাবৃদ্ধি বাদ দেওয়া যায়, বিরোধিতার অধিকারকে সুরক্ষিত করা যায়।
- মৃত্যুদণ্ডের ধারা রদ করা।
- সরকারি প্রকল্পের কাজ ও প্রভাব পর্যালোচনা করতে বাধ্যতামূলক সামাজিক অডিট ও দায়বদ্ধতার ব্যবস্থা চালু করা। শাসন পরিচালনার সব ক্ষেত্র এর পরিধিতে পড়বে এবং নাগরিকরা সরকারকে দায়বদ্ধ করতে পারবেন।
- সমস্ত সামাজিক কল্যাণের কর্মসূচিতে আধার ও বায়োমেট্রিক বাধ্যতামূলক করার নিয়ম রদ করা।
- টর্চার অ্যান্ড আদার ক্রুয়েল, ইনহিউম্যান অ্যান্ড ডিগ্রেডিং ট্রিটমেন্ট অর পানিশমেন্ট সংক্রান্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ অনুমোদন করা।
- আন্তর্জাতিক চুক্তির ক্ষেত্রে সংসদের অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক করতে সংবিধান সংশোধন।

ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা

সিপিআই(এম)-র অবস্থান হলো ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ এবং তা কার্যকরী করতে আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন। দৃঢ়তার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক হিংসার মোকাবিলা করা। রাষ্ট্র সর্বস্তরে ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ, বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবোধের প্রসার ঘটাবে।

সিপিআই(এম) সক্রিয় হবে

- নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল করতে।
- সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে রাজ্যে রাজ্যে তৈরি করা ধর্মান্তর-বিরোধী আইন বাতিল করতে।
- বিজেপি সরকার গুরুত্বপূর্ণ পদে আরএসএস-এর যে ব্যক্তিদের বসিয়েছে তাঁদের অপসারণ করতে।

– গো-রক্ষার নামে ও সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়ানোর লক্ষ্যে সংখ্যালঘুদের আক্রমণ করতে যেসব 'সেনা' বা বেআইনি বেসরকারি বাহিনী ও নজরদারি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে তাদের অবিলম্বে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়ানো ও সংখ্যালঘুদের ওপরে আক্রমণে যুক্ত সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ আইনি কাঠামো তৈরি করা, গণপ্রহারের মতো ঘটনার বিরুদ্ধে নতুন আইন প্রণয়ণ করা।
– সরকারি পদ যাই হোক না কেন সাম্প্রদায়িক হিংসায় যুক্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।
– সংখ্যালঘুরা যাতে সম্মান ও সমানাধিকার নিয়ে ভয়হীন ও বঞ্চনাহীন জীবনযাপন করতে পারেন সেই অধিকারকে রক্ষা করা।
– স্কুলের পাঠ্যবই ও উচ্চশিক্ষার পাঠক্রম থেকে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতমূলক সমস্ত বিষয় ছেঁটে ফেলা।

বিকল্প অর্থনৈতিক নীতি

সিপিআই(এম) যে অর্থনৈতিক নীতির জন্য কাজ করবে

– যোজনা কমিশন ফিরিয়ে আনা হবে।
– বৃদ্ধির সঙ্গে কর্মসংস্থানকে যুক্ত করা হবে যাতে পূর্ণ কর্মসংস্থান হয় এবং মানুষের হাতে টাকা আসে যা দিয়ে চাহিদা বৃদ্ধি হয়।
– সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে ধনীদের ওপরে, কর্পোরেট মুনাফার ওপরে এবং বিলাসপণ্যের ওপরে কর বসানো হবে।
– কৃষি উৎপাদন, গবেষণা ও সেচে সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে।
– পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে যথেষ্ট পরিমাণ সরকারি বরাদ্দ করা যেমন বিদ্যুৎ, গণ পরিবহণ, বন্দর, স্কুল, কলেজ, সরকারি হাসপাতাল।
– জনগণের ব্যবহারযোগ্য পণ্যের উৎপাদনে জোর দেওয়া, বিলাসী পণ্যে নয়।
– বীজ, সার, বিদ্যুৎ/ডিজেলের মতো কৃষি উপকরণে সরকারি ব্যবস্থা ও ভরতুকি।
– ছোট ও মাঝারি উদ্যোগেই সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান হয়, তাদের প্রতিযোগিতাক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে গবেষণায় জোর দেওয়া।
– আর্থিক দায়িত্ব ও বাজেট পরিচালনা আইন বাতিল করা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির বাজেটে সামাজিক ক্ষেত্রে বরাদ্দের একটি ন্যূনতম মাত্রা বাধ্যতামূলকভাবে স্থির করে দেওয়া।
– রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে সরকারি শেয়ার আর হ্রাস করা যাবে না, সরকারি ব্যাঙ্ক ও বিমাকে জোরালো করতে হবে, অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ঋণদান বৃদ্ধি করতে হবে।
– আর্থিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে বাধ্যতামূলকভাবে সংসদ ও আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবে।
– জাতীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ণে রাজ্য সরকারগুলিকে যুক্ত করতে হবে, রাজ্যগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে হবে, রাজ্যের রাজস্ব সংগ্রহের জন্য তাদের আরো আর্থিক নমনীয়তা দিতে হবে।

সম্পদ সংগ্রহ

সিপিআই(এম) যা করবে

- লঙ টার্ম ক্যাপিটাল গেইনস কর পুনরায় চালু করে ফাটকা মূলধনী লাভে কর বসাবে এবং শেয়ার লেনদেনে কর বৃদ্ধি করবে।
- ব্যাঙ্কে ঋণ বকেয়া রেখে যেসব লুটেরা বিদেশে চলে গেছে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবে এবং সুদসমেত সেই টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করবে।
- অতি ধনীদের জন্য সম্পত্তি কর পুনরায় চালু করবে এবং উত্তরাধিকার কর চালু করবে।
- বিধিবদ্ধ কর হার বৃদ্ধি করে কর্পোরেটের মুনাফার কর বৃদ্ধি করবে যাতে করের কার্যকরী হার কম না হয় এবং এর মাধ্যমে বিপুল রাজস্ব ক্ষতি না হয়।
- ভারতে সম্পত্তি রয়েছে এমন বিদেশি সংস্থার সঙ্গে শেয়ারের আন্তর্জাতিক লেনদেনে যে লাভ হচ্ছে তার ওপরে কর বসবে।
- যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে জিএসটি ঢেলে সাজানো হবে এবং রাজ্যগুলির সঙ্গে রাজস্ব ভাগ করে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

আর্থিক ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ

সিপিআই(এম)-র অবস্থান হলো:

- রাষ্ট্র ও জনগণের ওপরে আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির আধিপত্য খর্ব করতে সার্বভৌম আর্থিক নিয়ন্ত্রণের নীতি। জাতীয় আয়ের তুলনায় মোট আর্থিক দায় হ্রাস করতে নীতি প্রণয়ন।
- দ্বিপাক্ষিক বিনিময় লাইন ও অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে ডলার-বহির্ভূত বাণিজ্য চুক্তির সম্প্রসারণ ও স্থিতিশীল করা; ব্রিকস, এসওসি'র মতো আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলির আর্থিক সংহতি ও সমন্বয়কে জোরদার করা।
- ক্রিপটোকারেন্সির নিয়ন্ত্রণে শক্তিশালী ও সার্বিক নির্দেশিকা।
- মুদ্রার মূলধনী খাতে পূর্ণ রূপান্তরযোগ্যতার দিকে প্রবণতাকে বিপরীতমুখী করা, লগ্নীপুঁজির আগমন ও বহির্গমনের ওপরে নিয়ন্ত্রণ পুনরায় আরোপ করা।
- বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী (এফআইআই) পার্টি সিপেটরি নোট ব্যবহার করতে পারবে না, ফাটকা আর্থিক পদ্ধতির ওপরে নিয়ন্ত্রণ যাতে অতিরিক্ত ঝুঁকি এবং আর্থিক বাজারে অস্থিরতা হ্রাস করা যায়।
- রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঞ্চয় ও স্বশাসন সুরক্ষিত করা, আরবিআই'র পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।
- নতুন বেসরকারি ব্যাঙ্কের লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করা, ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ (সংশোধনী) আইন ২০১২ পর্যালোচনা করা এবং বিদেশি ব্যাঙ্ক ভারতীয় ব্যাঙ্ক কিনে নেবার ওপরে নিষেধাজ্ঞা।
- রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে শক্তিশালী করা; রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কোনো বেসরকারিকরণ চলবে না,

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশীদারিত্ব হ্রাসের জন্য ব্যাঙ্কিং আইনে প্রস্তাবিত সংশোধনী বাতিল করতে হবে, অগ্রাধিকার ক্ষেত্র চিহ্নিত বেসরকারি ব্যাঙ্কেও সরকারি শেয়ার কমানো চলবে না, ব্যাঙ্কগুলির ঝুঁকি কমাতে কার্যকরী মূলধন নিয়ন্ত্রণ চালু করা।

- বৃহৎ ঋণগ্রহীতাদের সুদের হার বৃদ্ধি; ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার হ্রাস; সেভিংস আমানত ও রিটেল আমানতে সুদের হার বৃদ্ধি, সাধারণ ছোটো ও আর্থিকভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে পরিষেবা চার্জ মকুব।
- কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ফেরত না দেওয়া ঋণ উদ্ধার করা; বেনামী সম্পত্তিকেও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণ ফেরত না দেওয়াদের জন্য ফৌজদারি আইনের সংশোধন; ইনসলভেন্সি ও ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড প্রত্যাহার করা।
- আমাজন, ফেসবুক, গুগলের মতো বড় তথ্য প্রযুক্তি কোম্পানিগুলির আর্থ-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আধিপত্য নিয়ন্ত্রণ করা, তথ্যের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা।
- বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাগুলির জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রণ চালু করা যাতে ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের হয়রানি বন্ধ হয়। বেসরকারি মাইক্রো ফিনান্স সংস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে টাকা দেওয়া বন্ধ করা; ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক সংস্থাকে পৃথকীকরণ করতে হবে।
- আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (সংশোধনী) আইন, ২০১৫ বাতিল করতে হবে।
- সমবায়কে রাজ্য তালিকাভুক্ত ক্ষেত্রে ফিরিয়ে দিতে হবে; ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৪৯-র সংশোধনী আইন ২০২০ বাতিল করতে হবে; প্রাথমিক কৃষি ঋণ সোসাইটিকে আরবিআই-র নজরদারিতে আমানত সংগ্রহের অনুমতি দিতে হবে; মহাজনী ঋণের ফাঁদ থেকে জনগণকে রক্ষা করতে সমবায় ব্যাঙ্ককে শক্তিশালী করতে হবে, সমবায় ব্যাঙ্ককে আয়কর থেকে রেহাই দিতে হবে।
- বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ডিএফআই-কে পৃথক করতে হবে; ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেবে।
- এলআইসি-তে সরকারি শেয়ার আর কমানো চলবে না; জীবনবিমা, মেডিক্যাল ও সাধারণ বিমায় জিএসটি প্রত্যাহার করতে হবে; রাষ্ট্রায়ত্ত সাধারণ বিমা কোম্পানিগুলিকে একসঙ্গে করে আয়তনের সুবিধা করে দিতে হবে।
- কর ছাড়ের দেশগুলিতে পুঁজির বেআইনি যাতায়াত নিষিদ্ধ করতে হবে; ন্যায্য করের জন্য ডাবল ট্যাক্সেশন এড়ানোর চুক্তির মধ্যে ফাঁকফোকর বন্ধ করতে হবে।
- আমানত রক্ষায় চিটফান্ড সংক্রান্ত আইন শক্তিশালী করা, পঞ্জি স্কিমের মালিকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে; ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারীদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
- আর্থিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়

সিপিআই(এম)'র অবস্থান :

- ভারতের স্বার্থরক্ষা করা এবং ভারতীয় পণ্যের মাসুল বাড়ানোর জন্য, 'বাণিজ্য যুদ্ধ' চাপিয়ে দেবার মার্কিনী উদ্যোগের বিরোধিতা।
- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের রক্ষা করতে ব্যবস্থা নেওয়া যার মধ্যে পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণও থাকবে।
- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জলসম্পদ, ব্যাঙ্কিং, আর্থিক পরিষেবাকে গ্যাটস-এর বাইরে রাখা; ট্রিপস চুক্তির পর্যালোচনার জন্য চাপ তৈরি করা।
- বর্তমানে চালু মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলির পর্যালোচনা করা; বর্তমান শর্তে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আর না এগনো।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের সার্বিক পুনর্বিন্যাসের জন্য সিপিআই(এম) চায় :

- ৩৫৬ নম্বর ধারার বদলে যথাযথ কোনো ধারা যুক্ত করা; অপব্যবহার বন্ধে ৩৫৫ নম্বর ধারার সংশোধন।
- রাজ্যপালদের বর্তমান ভূমিকা ও অবস্থান পর্যালোচনা করা। মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশ করা তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নামের তালিকা থেকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করবেন।
- কেন্দ্রীয় কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের ৫০ শতাংশ রাজ্যগুলিকে দিতে হবে; সারচার্জ ও সেস রাজ্যগুলির সঙ্গে ভাগ করতে হবে।
- কেন্দ্রীয় সরকারের করবহির্ভূত রাজস্বকেও বিভাজনযোগ্য তহবিলের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং যথাযথ সাংবিধানিক সংশোধনী আনতে হবে।
- এফআরবিএম আইন পাস করানোর মতো শর্ত রাজ্যগুলির ওপরে চাপানো চলবে না; অর্থ কমিশনের কাঠামো ও কাজের পরিধি সম্পর্কে রাজ্যগুলির মতামত নিতে হবে।
- কেন্দ্রীয় সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্প রাজ্য তালিকাভুক্ত করে রাজ্যগুলির হাতে তহবিল হস্তান্তর।
- আন্তঃরাজ্য পরিষদের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বাধ্যতামূলক হবে এই মর্মে সংবিধান সংশোধন করতে হবে, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদকে সাংবিধানিক মর্যাদা দিতে হবে; যোজনা কমিশনকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে; তা জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের প্রশাসনিক শাখা হিসাবে কাজ করবে।
- জিডিপি'র একটি অংশ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার জন্য ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে; রাজ্য সরকারের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্থাকে টাকা পাঠাতে হবে।

পরিকাঠামো

সিপিআই(এম) চায় :

- বেসরকারি কর্পোরেশনের জন্য নয়, জনগণ কেন্দ্রিক পরিকাঠামোগত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন।

- ভারতের পরিকাঠামো ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলির ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ প্রতিহত করা।
- জাতীয় পরিকাঠামো পাইপলাইন যা মৌলিক পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার দীর্ঘমেয়াদী লাভের সুযোগ করে দিচ্ছে তা প্রত্যাহার করা।
- ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন প্রত্যাহার করতে হবে; এই পথে তৈরি পরিকাঠামো সম্পদ দীর্ঘমেয়াদী উপহার হিসাবে বেসরকারি কর্পোরেশনের হাতে তুলে দেওয়া বন্ধ করতে হবে; বিলগ্নীকরণ ও পিপিপি সহ অন্যান্য পথে সরকারি পরিকাঠামোকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া ও দুর্বল করা বন্ধ করতে হবে।
- ন্যাশনাল ল্যান্ড মনিটাইজেশন পাইপলাইন প্রত্যাহার করা, বেসরকারি কর্পোরেশনের হাতে বিপুল, লাগোয়া জমি তুলে দিয়ে তাদের মুনাফার বন্দোবস্ত করা বন্ধ করতে হবে।
- সরকারি পরিকাঠামো তৈরি, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, রাজস্ব সংগ্রহ (বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, রেলওয়ে, সড়ক, বন্দর, বিমানবন্দর ইত্যাদি) কেবলমাত্র সরকারি দপ্তর ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার মাধ্যমেই করতে হবে।
- সরকারি পরিকাঠামোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেবার নীতি প্রত্যাহার করতে হবে; বেসরকারি এইসব সংস্থা সরকারি হাইওয়ে, রেল, বিমানবন্দর, গ্যাস, বিদ্যুতের লাইন ইত্যাদি থেকে যেভাবে রাজস্ব সংগ্রহ করছে (টোল, টিকিট অথবা অন্যান্য চার্জের মাধ্যমে) তা বন্ধ করা। এইসবের ফলে জনগণের কাঁধে বিপুল বোঝা চাপছে। এইসব কাজে সরকারি সংস্থাকে ব্যবহার করতে হবে।
- পুনঃনবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্র, শক্তির সঞ্চয়, অন্যান্য ভবিষ্যতের শক্তির উৎসের ওপরে বেসরকারি একচেটিয়া প্রতিষ্ঠা ও তাকে মদত দেওয়ার নীতি থেকে সরে আসতে হবে; দেশের শক্তিক্ষেত্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সরকারের নির্ণায়ক অংশীদারিত্ব চাই; ফসিল জ্বালানি থেকে পুনঃনবীকরণযোগ্য শক্তিতে রূপান্তরের সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত অংশের (বিশেষ করে কয়লা শ্রমিকদের) জীবনজীবিকা ও অর্থনৈতিক সুযোগ রক্ষা করার জন্য অংশগ্রহণের জোরালো ব্যবস্থা করতে হবে।
- ভরতুকিপ্রাপ্ত হারে বিদ্যুৎ ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে; বিদ্যুৎ (সংশোধনী) বিল ২০২২ প্রত্যাহার করতে হবে; টোটেক্স মডেলে বেসরকারি বিদ্যুৎ কর্পোরেশনগুলি প্রিপেইড স্মার্ট মিটারের যে ব্যবস্থা আনছে তা বন্ধ করতে হবে; সরকারি বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে বেসরকারিকরণ করা চলবে না; বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে উৎপাদন ও পরিষেবার সংস্থাগুলিকে একত্রে আনতে হবে; বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে চালু বেসরকারি লাইসেন্স বাতিল করতে হবে; বেসরকারি বিদ্যুতের বাজার এবং সময়ভিত্তিক নানারকম মূল্যের ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হবে।
- জরুরি পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বেসরকারি একচেটিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যার মধ্যে বন্দর-থেকে-বিদ্যুৎ কনগ্লোমারেট, ডেটা স্টোরেজও রয়েছে। ভারতীয় নাগরিকদের

সার্বভৌম ডেটা নিরাপদে রাখার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে শক্তিশালী পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। ব্যক্তিগত তথ্য বেসরকারি সংস্থা যাতে অবাধে ব্যবহার না করতে পারে তার জন্য নীতি রূপায়ণ করতে হবে।

- টেলিযোগাযোগ বিল ২০২৩ প্রত্যাহার; বেসরকারি সংস্থার স্বার্থবাহী টেলিকম নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের মাধ্যমে গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকায় টেলিকম ও ইন্টারনেট প্রসারের নীতি গ্রহণ করতে হবে; বিএসএনএল, এমটিএনএল-র মতো রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিকম সংস্থাকে জোরদার করার জন্য তাদের সমান সুযোগ দিতে হবে, দ্রুত ৪জি এবং ৫জি পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হবে। ইন্টারনেটের অধিকার নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগের যন্ত্র উৎপাদনে জাতীয় স্বনির্ভরতা গড়ে তুলতে হবে।
- রেলের নিরাপত্তা, গতি, রেলের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য রেল পরিকাঠামোয় বিপুল সরকারি বিনিয়োগ করতে হবে; রেলের স্টেশন, পণ্য করিডর, পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী ট্রেন বেসরকারিকরণের নীতি পরিবর্তন করতে হবে; রেলের রেক ও যন্ত্রাংশ উৎপাদনে দেশীয় প্রযুক্তিকে উৎসাহ যোগাতে হবে; রেল পরিষেবা পাওয়া ও তা উন্নত করা নিশ্চিত করতে হবে।
- জমির মালিকানা সহ বন্দরের মডেল প্রত্যাহার করতে হবে; পণ্য হ্যাণ্ডলিংয়ে নতুন স্টিভেডরিং নীতি প্রত্যাহার করতে হবে; পিপিপি মডেলে বড় বন্দরের হাসপাতাল আউটসোর্স করে দেওয়া বন্ধ করতে হবে। বড় বন্দরগুলির আধুনিকীকরণ করতে হবে।
- গুদামের পরিকাঠামোকে উন্নত করতে হবে– যেখানে খাদ্যশস্য ছাড়াও অন্যান্য ফসল এবং ফল সবজির মতো ফসল সংগ্রহ করে রাখা যায়। ওয়ার হাউসিং কর্পোরেশনের পরিকাঠামোকে বেসরকারি একচেটিয়ার হাতে তুলে দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

শিল্প

সিপিআই(এম) চায়

- বিভিন্ন প্রশাসনিক নির্দেশ ও নীতিতে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিপর্যস্ত ও ধ্বংস করার সর্বনাশা নীতি নেওয়া হয়েছে। তা বন্ধ করতে হবে; ডিআইপিএএম 'র উদ্যোগে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া বাতিল করতে হবে।
- বিশেষ করে মৌলিক ও স্ট্র্যাটেজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য লেভির বিপুল বোঝা প্রত্যাহার করতে হবে, আধুনিকীকরণ ও উন্নতির লক্ষ্যে লাভকে কার্যকরীভাবে পুনরায় বিনিয়োগের অনুমতি দিতে হবে, সমসুযোগ দিতে হবে ও সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে, দুর্বলতর পিএসইউ-কে নতুন মূলধন ও উন্নততর প্রযুক্তি যোগান দিয়ে সাহায্য করতে হবে, আমদানির ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হস্তান্তর নিশ্চিত করতে হবে, অধিকতর স্বশাসন দিতে হবে, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় করতে হবে।
- সার্বিক দীর্ঘমেয়াদী শিল্পনীতি চালু করতে হবে, বিনিয়োগের কৌশল ও 'মৌ'-এর

শর্ত নতুন করে ভাবতে হবে যাতে বিনিয়োগ অনুযায়ী কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যায়। মোট উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পরিষেবা ও ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের মধ্যে ফাঁক ভরাট করতে পারস্পরিক ভূমিকা স্থির করতে হবে।

- বিশ্ব উৎপাদন ব্যবস্থায় দেশীয় ক্ষেত্রে যাতে বর্ধিত মূল্য আরো বেশি যুক্ত হয় ও তা এখানেই কাজে লাগে তা নিশ্চিত করতে হবে। কঠোরভাবে রপ্তানি-আমদানি-বিনিয়োগ নীতি রূপায়ণ করেই তা সম্ভব। এমএনসি এবং টিএনসি-র ভ্যালু চেন-এ শ্রম নিয়ম কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে।
- নন ফিনান্সিয়াল সংস্থাগুলির ওপরে আর্থিক সংস্থার ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ সীমায়িত করার জন্য ইক্যুইটি বিনিয়োগে এবং একই সংস্থার বিভিন্ন সংস্থায় মালিকানার সীমারেখা নির্ধারিত করতে হবে; নন ফিনান্সিয়াল কোম্পানিগুলির জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ঋণদান নীতিকে সক্রিয় করতে হবে, গবেষণা, উন্নয়ন ও দেশীয় সক্ষমতা বৃদ্ধিকে মদত দিতে হবে, একচেটিয়া ও কার্টেল তৈরি হওয়া আটকাতে সক্রিয় নজরদারি আরোপ করতে হবে।
- শ্রম নিবিড় ট্র্যাডিশনাল শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবন করতে হবে, যেমন চটকল, বাগিচা, বস্ত্র, চর্মশিল্প, হস্তশিল্প, কয়ার ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির হাত থেকে দেশের শিল্পকে বাঁচাতে কঠোর নীতি প্রণয়ন করতে হবে; ভারতীয় পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি বাজার তৈরি করতে সক্রিয় হতে হবে।
- শ্রমনিবিড় ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে যথাযথ সুবিধা দিয়ে উৎসাহিত করতে হবে, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ব্যাঙ্ক থেকে যথেষ্ট পরিমাণ ঋণ দিতে হবে, গুচ্ছ শিল্প প্রকল্পে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার প্রবেশে কঠোর নিয়ন্ত্রণ জারি করতে হবে, দুর্দশায় পড়া নিম্ন আয়ের ক্ষেত্রে ঋণ মকুব করতে হবে।
- স্বনির্ভর গোষ্ঠী, সমবায়ের মতো গোষ্ঠীগত সংস্থাকে জোরদার করে উদ্যোগের সক্রিয়তা বাড়াতে সহায়ক নীতি গ্রহণ করতে হবে; এইসব সংস্থাকে বিশেষ করে গৃহভিত্তিক এবং ট্রাডিশনাল ক্ষেত্রে ভরতুকিতে ঋণ বৃদ্ধি করতে হবে; সমবায় ও কনসর্টিয়াম গড়ে তুলতে সহায়তা দিতে হবে।
- খুচরো বাণিজ্যে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করতে হবে; ই-কমার্স এবং দেশীয় কর্পোরেট রিটেইলরদের নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিং নীতি প্রণয়ন করতে হবে; ছোটো উৎপাদকদের সাহায্য করতে সরকারের নিজস্ব ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে।
- আমাজন, উবের, জোমাটোর মতো আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনগুলির একচেটিয়া ভাঙতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম পরিষেবা তৈরি করতে হবে, ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশে দেশীয় স্টার্ট-আপও সমবায়কে সহায়তা ও সুরক্ষা দিতে সরকারের ধারাবাহিক সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।
- টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ শহরে তথ্য প্রযুক্তির আরো কর্মসংস্থান এবং প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ দরকার, শ্রমিকদের অধিকারের কোনো ক্ষতি না করেই তা

করতে হবে; তথ্য প্রযুক্তির হার্ডওয়ার ও যন্ত্রাংশ উৎপাদনকে বৃদ্ধি করতে হবে; সরকারের সমস্ত দপ্তর ও পরিষেবাকে ডিজিটাইজ করতে রাষ্ট্রের মালিকানাধীন তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা চালু করতে হবে; অ্যালগরিদম এআই/এমএল নিয়ন্ত্রণের নিয়মবিধি চালু করতে হবে যাতে এইসব নতুন প্রযুক্তির সুবিধাকে জনগণের জন্য গণতান্ত্রিক রূপ দেওয়া যায়।

- বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা আইনকে সংশোধন করতে হবে যাতে কর ছাড় ক্রমে বন্ধ করা যায় এবং অনিয়ন্ত্রিত জমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যায়; সমস্ত এসইজেড-এ শ্রম আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।
- আইবিসি'র পর্যালোচনা করতে হবে; পিএলআই স্কিমের মাধ্যমে জনগণের টাকা অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া বন্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে; বৃহৎ বেসরকারি কর্পোরেশনকে নিঃশর্তে ঋণ মকুবের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।
- অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খনিজ যেমন রেয়ার আর্থ, লিথিয়ামের বাণিজ্যিক ঋণের অনুমতি দিয়ে এমএমডিআর আইনের যে সংশোধনী করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করতে হবে। এইসব খনিজ ভবিষ্যতের শক্তি ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয়। খনি ক্ষেত্রের আরও উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ বন্ধ করতে হবে, তার মধ্যে অশোধিত তেলের অনুসন্ধানও রয়েছে।
- অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ডকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তা প্রত্যাহার করতে হবে। দেশীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদন সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী করতে হবে, প্রতিরক্ষা উৎপাদনে বেসরকারি অংশগ্রহণের নীতি বাতিল করতে হবে , এই ক্ষেত্রে এফডিআই প্রবেশ বন্ধ করতে হবে।
- কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এবং কয়লার লজিস্টিক পরিকল্পনার জন্য সার্বিক নীতি প্রণয়ন করতে হবে; কয়লার আমদানির ওপরে নিয়ন্ত্রণ এবং যেসব বেসরকারি সংস্থা প্রতারণামূলক পদ্ধতিতে কয়লা আমদানি করেছে তাদের বিরুদ্ধে বিচারবিভাগীয় তদন্ত।

কৃষির পুনরুজ্জীবন

কৃষি সঙ্কটের মোকাবিলায়, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিপিআই(এম) নির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখছে:

- ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইনী গ্যারান্টি চাই, কৃষি উৎপাদনের মোট খরচের অন্তত দেড়গুণ হবে সেই মূল্য (সি২+৫০%)
- এমএসপি'র পরিধি বৃদ্ধি ও তা রূপায়ণ কর, এমএসপি'র পরিধিতে শস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি, সমস্ত রাজ্যে সংগ্রহ কার্যকরী কর, তিন বছরের মধ্যে ভারতে এপিএমসি মান্ডির সংখ্যা ১০,০০০ করতে হবে।
- বীজ, সার, কীটনাশক, ডিজেল, জল, বিদ্যুতের মতো কৃষি উপকরণের খরচ অনেকটা পরিমাণে কমাতে হবে, তার জন্য কর্পোরেট লবিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, সরকারি ভরতুকি বৃদ্ধি করতে হবে।

- তিন বছরে কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ দ্বিগুণ করতে হবে, বিশেষ জোর দিতে হবে সেচ, গ্রামীণ বাজার পরিকাঠামোয়। সমস্ত জলসম্পদের জন্য সংহত জলসম্পদ পরিচালনায় জোর দিতে হবে।
- কৃষিতে সস্তায়, সময় অনুযায়ী এবং যথেষ্ট পরিমাণ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ দিতে হবে; এই ঋণ যাতে কৃষিতে কর্পোরেটের স্বার্থে ব্যবহৃত না হতে পারে তার জন্য বিধি সংস্কার করতে হবে; কৃষিতে প্রত্যক্ষ ঋণের বিপুল অংশ যাতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের কাছে যায় তার জন্য নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।
- সমবায় ঋণ ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে, ঋণদান সমবায়গুলিকে নিয়মিত নির্বাচন সহ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করতে হবে।
- সারের ক্ষেত্রে পুষ্টিভিত্তিক ভরতুকির ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে; কৃষিতে ভরতুকি বৃদ্ধি করতে হবে, সারের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা পুনরায় চালু করতে হবে, সাধ্যের মধ্যে দামে কৃষি উপকরণ দিতে হবে।
- কৃষিতে বৃহৎ বাণিজ্যের স্বার্থরক্ষাকারী মেধাসত্ব ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে হবে; বেসরকারি কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে কঠোর বিধি চাই বিশেষ করে বীজের দাম, রয়্যালটি, কৃষকের বীজ সঞ্চয়ের অধিকার, জৈববৈচিত্র্য রক্ষায়।
- শোষণমূলক বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক অসম মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করতে হবে, যেমন ভারত-আশিয়ান চুক্তি, ভারত-ইইউ চুক্তি। সমস্ত বাণিজ্য আলোচনায় ভারতের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব ও সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো রক্ষা করতে হবে।

জমির প্রশ্ন

সিপিআই(এম)

- কর্পোরেট ও বৃহৎ কৃষি বাণিজ্যের স্বার্থে জমির ঊর্ধ্বসীমা শিথিল করার আইন পরিবর্তন করবে।
- ভূমি সংস্কারের জন্য দ্রুত ও সার্বিক পদক্ষেপ রূপায়ণ করবে; সিলিং-বহির্ভূত যে জমি রয়ে গেছে তার দখল নিতে এবং সমস্ত উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন করতে রাজ্য সরকারগুলিকে উৎসাহ দেবে। জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। মহিলাদের জমির সমান মালিকানা দিতে যৌথ পাট্টা দেওয়া হবে। আইনি প্রশ্নের সময়সীমা ভিত্তিক সমাধানের জন্য নতুন জমির ট্রাইব্যুনাল তৈরি করতে রাজ্য সরকারকে বর্ধিত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।
- সমস্ত স্বত্বের নথিভুক্তি করা হবে। সমস্ত রাজ্যে স্বত্ব নিয়ে চাষ করা কৃষকের অধিকার রক্ষা করা হবে। ভরতুকি, বিমা, আয়ের সহায়তা দেবার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত কৃষক কার্ড দেওয়া হবে।
- জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, রিসেটেলমেন্ট আইন ২০১৩-র ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ও স্বচ্ছতার অধিকারের ধারা সংশোধন করা হবে। জমির অধিগ্রহণের জন্য সমস্ত

আইনের ক্ষেত্রে তার সার্বজনীন প্রয়োগ হবে। জনস্বার্থ বলতে কী বোঝাবে তার কঠোর সংজ্ঞা থাকতে হবে, সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে তথ্য ও তার ভিত্তিতে পূর্ণ ও অগ্রিম সম্মতি লাগবে, সামাজিক প্রভাবের মূল্যায়ণ বাধ্যতামূলক করতে হবে, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন এমনভাবে দিতে হবে যাতে জীবনমান উন্নত হয় এবং জমির বর্ধিত মূল্যে তার অংশ থাকে।

- সাধারণের ব্যবহার্য জমি যেমন পশুচারণ, অভিন্ন জঙ্গল, ঝোপঝাড়ের জমিতে অনুপ্রবেশ ও দখলদারি প্রতিহত করা হবে।
- সরকারি দায়বদ্ধতায় থাকা সমস্ত সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের জমি রক্ষা করতে হবে এবং লিজ, বিক্রি বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে তা বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া চলবে না।
- কৃষিযোগ্য পতিত জমি ভূমিহীন ও গরিব কৃষক পরিবারের হাতে বিনামূল্যে তুলে দিতে হবে, তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- গ্রাম এবং শহরের সমস্ত ভূমিহীন অংশের জন্য আবাস স্থলের জমির ব্যবস্থা করতে হবে।

খাদ্য নিরাপত্তা

ক্ষুধামুক্ত ভারতের লক্ষ্যে সিপিআই(এম) চায়:

- বর্তমানে চালু নির্দিষ্ট লক্ষ্যের ব্যবস্থার বদলে সার্বজনীন গণবণ্টন, শুধুমাত্র আয়করদাতারা এর বাইরে থাকবেন। কোনো আধার সংযোগ থাকবে না।
- মাথাপিছু ১০ কেজি খাদ্যশস্য– ৫ কেজি বিনামূল্যে, ৫ কেজি ভরতুকিপ্রাপ্ত হারে।
- এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলির উদ্যোগকে সাহায্য করা।
- খাদ্যশস্য ছাড়াও গণবণ্টনে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য যেমন ডাল, ভোজ্য তেল, চিনি, কেরোসিন নিয়ন্ত্রিত দামে পাওয়া যাবে।
- আইসিডিএস এবং মিড-ডে মিলের খাদ্যের জন্য বরাদ্দ বর্ধিত হবে, গরম রান্না করা পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হবে এবং এই অধিকারকে খাদ্য নিরাপত্তা আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- খাদ্য নিরাপত্তা আইনের অধীনে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ৬ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হবে নিঃশর্তে।
- সমাজের প্রান্তিক মানুষ যেমন পরিযায়ী শ্রমিক, নিঃসম্বল, বিধবা, প্রতিবন্ধীদের জন্য বিনামূল্যে রান্নাঘরের মতো প্রকল্প করা হবে।
- দুর্গম এলাকায় রেশন ব্যবস্থাকে মজবুত করা যাতে আদিবাসীরা সহ প্রান্তিক মানুষের সুবিধা পেতে পারেন।
- ভরতুকিপ্রাপ্ত হারে বছরে ১২টি এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ করা হবে, কোনো আধার সংযোগের প্রয়োজন পড়বে না।
- খাদ্যশস্য সরবরাহের বদলে নগদ দেওয়ার পদ্ধতি চলবে না।

মূল্যবৃদ্ধি রোধ

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অবিরাম দামবৃদ্ধির মোকাবিলায় সিপিআই(এম)'র প্রস্তাব:

- পেট্রোপণ্যের বিনিয়ন্ত্রণের বদলে প্রশাসনিক পদ্ধতিতে মূল্য নির্ধারণ চালু।
- পেট্রোপণ্যে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক ও আমদানি মাসুল হ্রাস।
- প্রাকৃতিক গ্যাস ও রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ।
- সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশ মেনে খাদ্যপণ্যে আগাম বাণিজ্য বন্ধ করা।
- নিত্যপণ্যের মজুতদারি ও কালোবাজারি বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আইনের ধারা কঠোর করা।
- বেসরকারি গুদামে খাদ্যশস্যের মজুত জানানো বাধ্যতামূলক করা।
- গণবন্টনকে শক্তিশালী করা এবং সরকারি বাফার মজুতকে মূল্য স্থিতিশীল রাখতে ব্যবহার করা।
- দাম যখন বাড়ছে তখন খাদ্যশস্যের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ।
- অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা।

বৈদেশিক নীতি প্রসঙ্গে

সিপিআই(এম)'র দাবি :

- স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিদেশ নীতি চাই; উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে আরও বেশি সহযোগিতার পক্ষে প্রচার এবং বহুমেরু বিশিষ্ট দুনিয়াকে আরও মজবুত করে তোলা।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্র্যাটেজিক আঁতাত প্রত্যাহার করতে হবে এবং সার্বভৌম দেশসমূহে তাদের তরফে চাপিয়ে দেওয়া হস্তক্ষেপ, বহুবিধ নিষেধাজ্ঞা এবং সরকারগুলির পরিবর্তনে কার্যকরী বিরোধিতা জানাতে হবে।
- ভারতের জাতীয় সার্বভৌমত্বের সাথে আপসকামী এবং আমাদের দেশের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে স্বাক্ষরিত এমন বিভিন্ন মৌলিক চুক্তি প্রত্যাহার করতে হবে।
- ইজরায়েলের সাথে নিরাপত্তা ও সামরিক সম্পর্ক ভিত্তিক যাবতীয় চুক্তি বাতিল করতে হবে, ইজরায়েলের উপর রাষ্ট্রসংঘের তরফে নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবি জানাতে হবে।
- ১৯৬৭'র আগে নির্ধারিত সীমান্তকে মান্যতা দেওয়া এবং রাজধানী হিসাবে পূর্ব জেরুজালেমকে যুক্ত করেই প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সমর্থন জানাতে হবে।
- ভারতের সমস্ত প্রতিবেশী দেশের সাথে সুসম্পর্ক মজবুত করতে হবে এবং পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার মনোভাবকে প্রাধান্য দিয়েই যাবতীয় সাধারণ সম্পদ সম্পর্কিত সমস্যাকে অবিলম্বে সমাধান করতে হবে।
- আলোচনার মাধ্যমেই চীনের সাথে সীমান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করতে হবে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের সর্বাত্মক উন্নয়নে সচেষ্ট হতে হবে।
- আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ সহ দীর্ঘস্থায়ী বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে, দু'দেশের জনগণের

মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিকে কার্যকরী করতে পাকিস্তানের সাথে পুনরায় আলোচনা শুরু করতে হবে।

– তামিলভাষী-মানুষদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদনকে মান্যতা দিয়ে শ্রীলঙ্কার উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলের এলাকাগুলিতে স্বায়ত্বশাসনভিত্তিক ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সে দেশের সরকারের সাথে কার্যকরী আলোচনা করতে হবে।

জাতীয় নিরাপত্তা প্রসঙ্গে

সিপিআই(এম)'র দাবি :

– ভারত-মার্কিন ডিফেন্স ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি, কোয়াড (QUAD) এবং আইটুইউটু (I2U2)-র মতো জোট প্রত্যাহার করতে হবে।

– আমাদের অঞ্চলের স্থাপিত সমস্ত বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটির অপসারণ চাই। বিশেষত ভারত মহাসাগরে দিয়েগো গার্সিয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ঘাঁটিটিকে, ওখানে পারমাণবিক অস্ত্র সজ্জিত রয়েছে।

– পারমাণবিক অস্ত্র সহ বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য মারণ এমন যাবতীয় অস্ত্রের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন। এধরণের অস্ত্রের মধ্যে রাসায়নিক (কেমিক্যাল) ও জৈব (বায়োলজিক্যাল) অস্ত্রসমূহকেও ধরতে হবে।

– এমন যেকোনো পাম্পিং স্টেশন থেকে ভারতীয় স্থলসেনা, বায়ুসেনা ও নৌবাহিনীর প্রয়োজনে তেল নেওয়ার কাজ বন্ধ করতে হবে যে স্টেশনগুলি কার্যত দুনিয়াজুড়ে যুদ্ধ বাধাতে পরিচালিত হয়।

– এমন কোনো নীতি গ্রহণ করা যাবে না যা ভবিষ্যতে মহাকাশ ও পৃথিবীর দুই মেরুপ্রদেশে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সহায়ক।

– যেকোনো সংঘাতের পরিবেশে কূটনৈতিক বোঝাপড়া, পারস্পরিক আলোচনা ও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় মতামত বিনিময় চালাতে হবে।

– সাইবার স্পেসের সামরিকীকরণ করা চলবে না; ফিসিং ও অন্যান্য সাইবার অ্যাটাক থেকে প্রত্যেককে সুরক্ষা দিতে হবে। স্ন্যুপিং ও নজরদারি (সার্ভিলিয়েন্স) চালানোর ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে।

– জাতীয় সুরক্ষার প্রসঙ্গে ব্যবহৃত যাবতীয় যন্ত্রপাতির জন্য খরচ ইত্যাদিকেই সংসদের নজরদারির আওতায় রাখতে হবে, এধরনের সমস্ত কাজেই নিরীক্ষণের ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

– মানবজীবনের সুরক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। যথাযোগ্য সুরক্ষানীতি বলতে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার বিভিন্ন এজেন্সিকে একে অন্যের সাথে নিবিড় সংযোগ বজায় রাখতে হবে।

– পাবলিক সেক্টর ডিফেন্স সংক্রান্ত যাবতীয় ইউনিটের আরও বিস্তৃত করতে হবে, তাদের সময়োপযোগী উন্নয়ন করতে হবে এবং দেশের সুরক্ষা ও প্রতিরক্ষাকে কার্যকরী করতে সংস্থাগুলির স্বশাসন সুনিশ্চিত করতে হবে।

– প্রতিরক্ষা প্রসঙ্গে যাবতীয় চুক্তি ইত্যাদির প্রশ্নে দুর্নীতি রুখতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বজায় রাখতে হবে। দেশের সুরক্ষা প্রসঙ্গে যেকোনো দুর্নীতিতে দ্রুত তদন্ত শেষ করতে হবে, বিচার ও শাস্তিবিধানের কাজে ঢিলেমি চলবে না।

জম্মু ও কাশ্মীর প্রসঙ্গে

নিজেদের দৃঢ় অবস্থান প্রসঙ্গে সিপিআই(এম) জানাচ্ছে :

– সংবিধানের ৩৭০ ধারা এবং ৩৫এ ধারা দুটি পুনরায় কার্যকরী করতে হবে। লাদাখ'কে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন দিতে হবে। অবিলম্বে জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন হতে হবে।

– জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্ত অংশের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলের সাথে যত দ্রুত সম্ভব মতামত বিনিময় ও উপযুক্ত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

– কাশ্মীরের জনমানসে আস্থাবর্ধক পরিবেশ ফিরিয়ে দিতে হবে। সমাজের সমস্ত অংশের সাথে কার্যকরী সংযোগ স্থাপন করতে হবে। তাদের ন্যায্য ক্ষোভকে মর্যাদা দিয়েই সমাধান করতে হবে।

– রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করতে হবে। নির্দিষ্ট করে বলা যায় জম্মু ও কাশ্মীরের যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হবে, এই প্রসঙ্গে সে রাজ্যে ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিকাঠামোসমূহকে পুনরায় কার্যকরী করে তুলতে হবে।

– সীমান্তবর্তী এলাকা ব্যতীত অন্য সর্বত্র আফস্পা আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

দেশের উত্তর-পূর্ব অংশের পরিস্থিতি প্রসঙ্গে

সিপিআই(এম)'র বক্তব্য হলো :

– মণিপুরের অশান্ত পরিবেশের অবসান চাই, এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত রাজনৈতিক সমাধানই জরুরি। এই কাজে ঐ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে অপসৃত করা দরকার। সংশ্লিষ্ট সমস্যায় যুক্ত সমস্ত পক্ষের সাথে আলোচনা করেই সকলের জন্য সমানাধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।

– সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে আসামে এনআরসি'র কাজ এখনই শেষ করতে হবে। এই কাজে একজনও ভারতীয় যেন বাদ না পড়েন তা নিশ্চিত করতে হবে। যারা ইতিমধ্যে বাদ পড়েছেন তাদের নাগরিকত্বের আবেদন গৃহীত হতে হবে, তালিকাভুক্তদের প্রত্যেককে সঠিক পরিচিতিপত্র দিতে হবে। যে সকল আধার কার্ড ব্লক করে দেওয়া হয়েছে সেসবই পুনরায় কার্যকরী করতে হবে।

– দেশের উত্তর-পূর্ব অংশ ও তার প্রাকৃতিক পরিকাঠামোর উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ঐ এলাকার যুবসমাজের জন্য রোজগার ও কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

– বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অধিকার প্রসঙ্গে সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলের অন্তর্গত প্রশাসনিক ও পরিচিতি বিষয়ক অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত রাখতে হবে।

শ্রমিকশ্রেণি

সিপিআই(এম)-র অবস্থান :

– শ্রমিকদের বিধিবদ্ধ ন্যূনতম মজুরি কোনোভাবেই মাসিক ২৬,০০০ টাকার চাইতে কম যেন না হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্সের সাথে তুলনা করেই ন্যূনতম মজুরিকে নির্ধারণ করতে হবে। দিনে আট ঘন্টার চাইতে বেশি শ্রম করতে যেন না হয় সে প্রসঙ্গে কড়া আইনি বিধিনিষেধ জারি করতে হবে। সংবিধানের ৪৩নং ধারা অনুযায়ী মজুরিকে বিবেচনা করতে হবে, এই কাজে সংসদীয় বন্দোবস্ত পাকা করতে হবে যাতে তা সুনিশ্চিত হয়।

– কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় কর্মরত শ্রমিকদের জন্য পর্যায়ক্রমিক মজুরি সংশোধন (পিরিয়ডিক ওয়েজ রিভিশন)-র ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতাকে সেই সংশোধনের শর্ত হিসাবে নির্ধারণ করলে চলবে না।

– কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৮ম বেতন কমিশন স্থাপন করতে হবে। ২০২০-র জানুয়ারি থেকে ২০২১ অবধি বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দিতে হবে।

– অঙ্গনওয়াড়ি, আশা, এম ডি এম কর্মী সহ কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে নিযুক্ত প্রত্যেককেই নথিভুক্ত কর্মচারীর মর্যাদা দিতে হবে। তাদের আইনানুগ ন্যূনতম মজুরি, পেনশন, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি যাবতীয় সামাজিক সুরক্ষা সহ অন্যান্য প্রাপ্য দিতে হবে। এই সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।

– নয়া চার শ্রম কোডের বিবৃতি অনুযায়ী যাবতীয় শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী ও মালিকের স্বার্থ সুরক্ষাকারী সংশোধনীগুলি বাতিল ঘোষণা করতে হবে।

– বিভিন্ন রাজ্যের কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকদের অধিকারের প্রসঙ্গে তার যাবতীয় কাজকেই জাতীয় শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ছাঁটাই কিংবা উৎপাদন বন্ধ থাকার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আইডি অ্যাক্টের অন্তর্গত বিধানকে প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগকে আরো মজবুত করে তুলতে হবে। সমস্ত জেলায় ও শিল্প কেন্দ্রগুলিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনাল ও লেবার কোর্ট স্থাপন করতে হবে।

– অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় সংশ্লিষ্ট আইনগুলিকে সময়োপযোগী ও যথাযথরূপে সংশোধন করতে হবে। লেবার স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রস্তাবনাসমূহকে প্রয়োগ করতে হবে। পরিচয় শ্রমিক, সবুজায়নের কাজে কর্মরত শ্রমিকদের সুরক্ষায় জাতীয় তহবিল গঠন করতে হবে। বার্ধক্যকালীন পেনশন, মাতৃত্ব ও সদ্যোজাত শিশুর উপযুক্ত যত্নের উদ্দেশ্যে বিবিধ সুবিধা দিতে হবে। জীবনবিমা সহ বিভিন্ন দুর্ঘটনায় সংশ্লিষ্ট আইনানুগ সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা দিতে হবে। এই কাজে

যাবতীয় অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক কর্মচারীদেরই কভারেজের আওতাভুক্ত করতে হবে।

- গিগ শ্রমিক, বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কর্মরত, অ্যাপ দ্বারা পরিচালিত পরিষেবার কাজে নিযুক্ত এবং বাড়ি থেকে কাজে যুক্তদের কাজকেও আইনি কাজের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, একাজে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে। সমস্ত আইনের অধীনে আইটি এবং আইটিইএস কর্মীদের কভারেজ সুনিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে যে কোন আইনি ফাঁক ফোকর ইত্যাদি রোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- নয়া পেনশন স্কিম এবং পিএফআরডিএ আইন বাতিল করতে হবে। মালিকপক্ষ এবং সরকার এই যৌথ উদ্যোগে তহবিল গড়ে তুলে উপযুক্ত পেনশন নীতি গ্রহণ করে প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য তার কর্মজীবনের শেষ বেতনের ন্যূনতম পঞ্চাশ শতাংশ পেনশন হিসেবে নির্ধারিত করতে হবে।
- ২০১৯-এর মোটরভেহিকল সংশোধনী আইন প্রত্যাহার করতে হবে।
- গোপন ব্যালট মারফত ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে। সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক বিধি জারি হবে। আইএলও কনভেনশনের ৮৭নং ও ৯৮নং (সেজ শ্রমিকদের অধিকার প্রসঙ্গে) এবং ১৮৯নং (গৃহকর্মীদের প্রসঙ্গে) প্রস্তাবনাকে অনুমোদন দিতে হবে। প্রতি বছর যথাবিহিতরূপে ভারতীয় শ্রম সম্মেলন (ইন্ডিয়ান লেবর কনফারেন্স) সম্পন্ন করতেই হবে।
- সরকারি ও বেসরকারি দু'ক্ষেত্রেই সংস্থার পরিচালকমন্ডলীতে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। যাবতীয় দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক আলোচনার পরিসরকে শক্তিশালী করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে বিনা আলোচনায় কোনোরকম শ্রম আইন প্রণয়ন করা চলবে না। শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে যথোপযুক্ত সামাজিক সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।
- কন্ট্রাকচুয়ালাইজেশন ও ক্যাজুয়ালাইজেশন দুটিকেই নিরুৎসাহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে ১৯৭০ সালের কন্ট্রাক্ট লেবার (রেগুলেশন অ্যান্ড অ্যাবলিশন) আইনকে কঠোরভাবে কার্যকরী করতে হবে। একই কাজে নিয়মিত শ্রমিকদের প্রাপ্য বেতনকে মাথায় রেখেই চুক্তি শ্রমিকদের সমান মজুরি দিতে হবে। তাদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও দিতে হবে। স্থায়ী কিংবা দীর্ঘস্থায়ী কাজের ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং নীতি চলবে না। নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বন্ধ করতে হবে। বিকাশ শ্রমিক সহ অসংগঠিত ক্ষেত্রের সমস্ত শ্রমিকদের ইউনিয়ন করা ও ধর্মঘটের ন্যায় মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করার আইন হতে হবে।
- গৃহকর্মী হিসেবে কর্মরতদের পাশাপাশি সকল নারী শ্রমিকদের জন্যই সমান কাজে সমান মজুরির নীতি গ্রহণ করতে হবে। এদের প্রত্যেককে মাতৃত্বকালীন সুযোগ সুবিধা, পেনশন ও স্বাস্থ্যবিমা সহ যাবতীয় সামাজিক সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। কর্মরত মায়েদের জন্য ক্রেসের সুবিধা এবং বয়স্কদের জন্য জরুরি পরিচর্যার সুবিধা দিতে হবে।

- কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানি প্রতিরোধে উপযুক্ত আইনের কঠোর বাস্তবায়ন করতে হবে। রাতের শিফটে কর্মরত মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।
- শ্রমিক স্বার্থে গঠিত শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডকে সক্রিয় করতে হবে। এমন সমিতিতে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

মৎস্য চাষীদের প্রসঙ্গে:

- মৎস্য চাষে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য বিশেষ শ্রমিক কল্যাণ বোর্ড গঠন করতে হবে। একাজের নিযুক্ত প্রত্যেককে সঠিক পরিচয়পত্র ও বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের সুবিধা দিতে হবে।
- বিদেশি ট্রলার নিষিদ্ধ করতে হবে। বড় ট্রলার ব্যবহার করে গভীর সমুদ্র থেকে ব্যাপক আকারে মাছ ধরা বন্ধ করতে হবে। দেশের জলসীমার প্রান্তিক অংশে বড় কর্পোরেট সংস্থার পাশাপাশি ছোটো মৎস্যজীবীদেরও কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।
- ২০১৮ সালের সিআরজেড বিজ্ঞপ্তি বাতিল করতে হবে। এতে উপকূল এলাকায় মৎস্যজীবীদের কাজের অধিকার বিঘ্নিত হয়।
- ব্লু ইকনোমি নীতিকে বাতিল করতে হবে। এই নীতির সুযোগ নিয়ে সাগরে নিমজ্জিত প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের উপরে বিভিন্ন বেসরকারি ও বিদেশি কর্পোরেটরা নিজেদের দখল কায়েম করে।

কৃষকদের প্রশ্ন

- ভারতের গ্রামাঞ্চলে ছোটো, মাঝারি ও দুঃস্থ কৃষক ও খেতমজুরদের যাবতীয় ঋণ মকুব ঘোষণা করতে হবে। এমন ঋণ মকুব করার ক্ষেত্রে প্রাইভেট সংস্থা কিংবা সরকারি প্রতিষ্ঠান উভয়কেই বিবেচনায় রাখতে হবে।
- সারা দেশের জন্যই শস্য বিমা নীতি প্রণয়ন করতে হবে। এহেন বিমার অর্থ মূল্য রাজ্যভিত্তিক পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন হতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে শস্য বিমার প্রকৃতি ফসল ফলানোর কাজে সংশ্লিষ্ট বিপদ ও ফসল বিক্রির কাজে সমস্যা উভয়কেই বিবেচনা করে নির্ধারিত হয়। প্রত্যেক গ্রামে আবহাওয়া সংক্রান্ত নজরদারি কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত বিমা সংস্থাগুলিকেই শস্য বিমার কাজে নিজেদের পরিসর প্রশস্ত করতে হবে। ফসলের দামে সুস্থিতি বজায় রাখতে একটি সহায়ক তহবিল গড়ে তুলতে হবে যা কৃষকদের ফসল বিক্রির সময় সুরক্ষিত রাখবে।
- বিভিন্ন প্রান্তিক, ছোটো ও মাঝারি কৃষক ও খেতমজুর পরিবারগুলির জন্য আইনানুগ সুরক্ষা সহ উপযুক্ত পেনশনের বন্দোবস্ত করতে হবে।
- কৃষি উৎপাদন, চাষের কাজে ঋণ, দুগ্ধ উৎপাদন, জল ব্যবহার, কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ, শস্য মজুত রাখা, শস্যের প্রক্রিয়াকরণ ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের যাবতীয় ক্ষেত্রে সমবায়কে উৎসাহিত করতে হবে, আরও মজবুত করতে হবে। এ সমস্ত সমবায়গুলিকে রাজ্য সরকারের অধীনে থেকেই কার্যকরী রূপে সক্রিয় হতে

হবে। আর্ন্ত সমবায়ের যে ব্যবস্থাটি রয়েছে তাকে এর থেকে আলাদা রাখতে হবে।

- কৃষকের নিজের শ্রমে ফলানো ফসল নিজেরাই প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বিক্রি করায় উৎসাহ দিতে হবে। একাজে গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে যুক্ত করতে হবে। বিভিন্ন সমবায় সংস্থাগুলি পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এখানেও সমবায় যাতে বেসরকারি কর্পোরেট সংস্থার সামনে বিপদে না পরে তা দেখতে হবে।
- কৃষি উৎপাদন বাড়াতে উপযুক্ত সরকারি ভরতুকি বৃদ্ধি করতে হবে। উৎপাদন, যোগান সহ পশুখাদ্যের বিক্রি, বাজারের ওঠানামার প্রভাব থেকে পশুপালকদের সুরক্ষা দেওয়া ইত্যাদি কাজে একটি সার্বিক বিমা প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রণয়ন করতে হবে। এই বিমা মহামারীর ন্যায় পরিস্থিতিরও মোকাবিলা করবে।
- প্রান্তিক ও ছোটো চাষিদের এমজিএনআরইজিএসের আওতাভুক্ত করতে শ্রমক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি ভরতুকির পরিসর বৃদ্ধি করতে হবে।

খেতমজুরদের প্রসঙ্গে

- খেতমজুরদের ন্যূনতম মজুরি, দরকষাকষির অধিকার, পেনশন ও দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের মতো সামাজিক সুরক্ষার লক্ষ্যে সার্বিক আইন প্রণয়ন, কেন্দ্রীয় বরাদ্দসহ।
- রেগায় ১০০ দিনের কাজের ঊর্ধ্বসীমা তুলে দিয়ে তা ২০০ দিন করা, কোনো রাজ্যেই রেগায় দৈনিক ন্যূনতম ৭০০ টাকা মজুরির কম মজুরি হবে না, রেগায় যখন কাজ দেওয়া যাচ্ছে না তখন সময়ের মধ্যে তাদের বেকার ভাতা দিতে হবে।
- সমস্ত গ্রামীণ শ্রমিক ও খেতমজুরদের ন্যূনতম মজুরি ৭০০ টাকা করা, সমকাজে মহিলাদের সমান মজুরি, অন্তঃসত্ত্বা মহিলা খেতমজুরদের বিশেষ ভাতা, ন্যূনতম মজুরি আইন কঠোর ও কার্যকরীভাবে প্রয়োগের জন্য গোটা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো।
- সমস্ত খেতমজুরদের ন্যূনতম মৌলিক সুযোগসুবিধা দিতে হবে যেমন আবাস, শৌচাগার, পানীয় জল, চিকিৎসার সুযোগ, আঘাত লাগলে প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরিবহণের সুযোগ।
- পরিযায়ী খেতমজুরদের সুরক্ষায় বিকেন্দ্রীকৃত ত্রিপাক্ষিক বোর্ড, এক জানালা ব্যবস্থা, দেশের সর্বত্র প্রযোজ্য ব্যবস্থা।
- জমি অধিগ্রহণ আইন, ২০১৩-র অধীনে সমস্ত জমি অধিগ্রহণ ও উচ্ছেদের ক্ষেত্রে ভূমিহীন খেতমজুরকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে, তাদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন পাবার অধিকার থাকবে।
- দলিত ও আদিবাসী খেতমজুরদের সাংবিধানিক অধিকারের স্বীকৃতি, দলিত ও আদিবাসী বসতি এলাকার সার্বিক উন্নয়ন।
- সমস্ত রকম জাতিগত, জনগোষ্ঠীগত, ধর্মীয় ও লিঙ্গভিত্তিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে

দলিত ও আদিবাসী খেতমজুরদের সুরক্ষায় পৃথক আইন ও আদালতের ব্যবস্থা।
– কৃষি এলাকায় সরকারি অর্থে শিশুদের যত্ন ও ক্রেশের ব্যবস্থা।

সমানাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার
মহিলা

সিপিআই(এম)-র অবস্থান:

– সংসদ ও রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ এখনই চালু করতে হবে, জনগণনা বা ডিলিমিটেশনের জন্য অপেক্ষা করা যাবে না।
– সমস্ত মহিলাদের জন্য বৈবাহিক ও উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে সমান অধিকারের জন্য আইন চালু, নারী ও শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের আইন জোরদার করা, সমস্ত পরিত্যক্ত মহিলার সুরক্ষা, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
– মহিলা ও শিশুদের বিরুদ্ধে হিংসা ভয়াবহভাবে বেড়ে গেছে। তার মোকাবিলায়, দোষীদের শাস্তি দিতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে:
– ভার্মা কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করা যা বর্তমান সংশোধিত আইনে বাদ পড়েছে; লিঙ্গ সমতা সংক্রান্ত বিষয় শিক্ষার পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা; পাবলিক স্পেসে মহিলাদের নিরাপত্তা বাড়াতে পদক্ষেপ নেওয়া, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত সমস্ত মহিলার সব জায়গায় নিরাপদে যাতায়াতের ব্যবস্থা; তফসিলি জাতি ও আদিবাসী মহিলাদের বিরুদ্ধে জাতিভিত্তিক অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি; যেসব কর্মচারী বা পুলিশকর্মী এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে দেরি করছে তাদের বিরুদ্ধে জরিমানার ব্যবস্থা; ফাস্ট ট্র্যাক আদালত তৈরি করা, গার্হস্থ্য ধর্ষণকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা, ভারতীয় দন্ডবিধির বর্তমান ৪৯৮-এ ধারাকে রক্ষা করা; যৌন হিংসা ও অ্যাসিড আক্রমণের শিকার মহিলাদের, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে পূর্ণ আর্থিক সহায়তা সহ পুনর্বাসনের প্রকল্প, গার্হস্থ্য হিংসা ও যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে আইন যথাযথভাবে রূপায়ণের জন্য বাজেটে যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ; পিসিপিএনডিটি আইন (লিঙ্গ নির্ধারণ ও মহিলা ভ্রূণ হত্যা) কঠোরভাবে প্রয়োগ করা ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া নজরদারি কমিটিকে সক্রিয় করা।
– এইসব ক্ষেত্রে নতুন আইন চাই: তথাকথিত সম্মান রক্ষায় অপরাধের বিরুদ্ধে পৃথক আইন, নারী ও শিশু পাচারের বিরুদ্ধে আইন, মহিলা ও শিশুদের ভরণপোষণের আইন ও ত্রিপুরার পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার পরিত্যক্ত মহিলাদের জন্য যে প্রকল্প করেছিল তেমন প্রকল্প; একক মহিলা, বিধবা ও মহিলা প্রধান পরিবারের জন্য বিশেষ প্রকল্প; স্বনির্ভরগোষ্ঠী ও ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনে আইন এবং ৪ শতাংশের বেশি সুদ হবে না এই মর্মে গ্যারান্টি, তফসিলি জাতি ও আদিবাসী মহিলাদের বিশেষ ছাড়, গৃহসহায়িকা এবং গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের সুরক্ষায় আইন।
– বিভিন্ন স্তরের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য আচরণবিধি যাতে প্রকাশ্য মন্তব্য এবং

কথাবার্তায় মহিলাদের সম্ভ্রম রক্ষা করা হয় এবং লিঙ্গবৈষম্য ও মহিলা বিরোধী কোনো কথা তাঁরা না বলেন।

– জেন্ডার বাজেট করার সময়ে বরাদ্দ অন্তত ৪০ শতাংশ করতে হবে।

শিশু

সিপিআই(এম) শিশুদের অধিকারের সপক্ষে জোরালো সওয়াল করে এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাবে।

– ০-৬ বয়সী সমস্ত শিশুর জন্য আইসিডিএস সার্বজনীন করা, আইসিডিএস-র বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া বন্ধ করা, অঙ্গনওয়াড়িতে ও স্কুলে পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ক্রেশের ব্যবস্থা করা।
– ৩-১৮ বয়সী সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার আইনের পরিধি বৃদ্ধি।
– বসবাসের এলাকায় শিশুদের খেলাধূলার জন্য মাঠের ব্যবস্থা করা।
– শিশু শ্রম (নিষেধাজ্ঞা ও নিয়ন্ত্রণ) আইনে বিপজ্জনক ও অবিপজ্জনক কাজের যে পার্থক্য করা রয়েছে তা অপসারণে সংশোধনী যাতে সমস্ত রকমের শিশু শ্রম নিষিদ্ধ করা যায়, একই সঙ্গে কর্মরত শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য বর্ধিত বরাদ্দ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়িত করা।
– আদিবাসী, দলিত, সামাজিকভাবে প্রান্তিক অংশের শিশুদের সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য থেকেই যাচ্ছে। তা কমিয়ে আনতে বিশেষ পদক্ষেপ। এই লক্ষ্যে আধুনিক ব্যবস্থাসহ আবাসিক স্কুল ও হস্টেল, তৈরি করা, সবস্তরেই বৈষম্যের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ।
– অতিরিক্ত পুষ্টি, টিকাকরণ, প্রাক্-স্কুল নন ফরমাল শিক্ষা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, দ্রুত উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থার মতো মৌলিক পরিষেবার পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে।
– শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন অপরাধ থেকে সুরক্ষার আইনের কঠোর রূপায়ণ।
– পথশিশুদের আশ্রয় ও সামাজিক পরিষেবার ব্যবসথা, নিখোঁজ শিশুদের উদ্ধারে আরো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।
– শিশুদের জন্য বিচারের ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে তারা যাতে সমাজে আবার মিশতে পারে তার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে বোধসম্পন্ন করা।

তরুণদের জন্য

সিপিআই(এম) চায়:

– কাজের অধিকারকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে।
– কর্মসংস্থান অথবা বেকার ভাতা।
– কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত শূন্যপদ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পূরণ করা।

– তরুণদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে নতুন জাতীয় যুব নীতি প্রণয়ন।
– যুবকদের ক্রীড়া প্রসারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফে ক্রীড়া মিশন তৈরি করা। খেলাধূলার প্রসার ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
– তরুণদের সার্বিক-শারীরিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক-বিকাশের জন্য, তাদের পছন্দের পথে তারা যাতে এগিয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করা।
– নেশাদ্রব্যের প্রসারের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান।

তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী

সিপিআই(এম) বর্ণব্যবস্থার অবসান ও সব ধরনের জাতিগত নিপীড়নের অবসান চায়।

তফসিলি জাতির জন্য স্পেশাল কমপোনেন্ট পরিকল্পনা ও ট্রাইবাল সাব প্ল্যানের কেন্দ্রীয় আইন থাকতে হবে যাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা বরাদ্দে জনসংখ্যার অনুপাতে বরাদ্দ হতে পারে।

তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের সমস্ত ভূমিহীন পরিবারকে ৫ একর করে কৃষিযোগ্য জমি বণ্টন করতে হবে।

বেসরকারি ক্ষেত্রে সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় আইন চাই।

এসসি, এসটি (নিপীড়ন মোকাবিলা) আইন ১৯৮৯ এবং পিএ সংশোধনী ২০১৫-র বাস্তবায়ন করতে হবে। এই আইনকে সংবিধানের নবম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এসসি, এসটি (নিপীড়ন মোকাবিলা) আইনের ১৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী সমস্ত জেলায় বিশেষ আদালত চাই।

শিক্ষাঙ্গনে এবং কর্মস্থলে জাতপাত, ধর্মীয়, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য মোকাবিলায় একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে হবে।

সাধারণ জনগণনার অংশ হিসাবে অবিলম্বে জাতভিত্তিক গণনা করতে হবে।

সমস্ত এসসি, এসটি ছাত্রদের সার্বজনীন হস্টেল ও বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

সংরক্ষিত আসন, পদ, পদোন্নতির বকেয়া সময়সীমা নির্দিষ্ট করে পূরণ করতে হবে।

এখনও পর্যন্ত সংরক্ষণের বাইরে থেকে যাওয়া ক্ষেত্রে সংরক্ষণ চালু করতে হবে।

শারীরিকভাবে বর্জ্য পরিষ্কার নিষিদ্ধ করতে আইনের ফাঁকফোকর বন্ধ করতে হবে, এই কাজে যাঁরা যুক্ত তাঁদের পুনর্বাসন দিতে হবে।

সাফাই পরিষেবার চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের নিয়মিতকরণ করতে হবে।

আবাস ও নাগরিক সুবিধার ক্ষেত্রে অন্যান্য অংশের সঙ্গে এসসি, এসটিদের পার্থক্য কমাতে যথাযথ বরাদ্দ সহ বিশেষ অভিযান।

দলিত খ্রিস্টান ও মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ প্রসারিত করতে হবে।

তফসিলি আদিবাসী

সিপিআই(এম)-র অবস্থান:

সমস্ত সরকারি ক্ষেত্রে এসটি সংরক্ষিত শূন্যপদ পূরণে আইনি বাধ্যতাসহ সময়সীমা

করতে হবে।

আদিবাসীদের জমির অধিকার রক্ষা করতে হবে, তাদের কাছ থেকে অবৈধভাবে নিয়ে নেওয়া জমি ফেরত দিতে হবে। ব্যবসার সুবিধা করার নামে জমি অধিগ্রহণে আদিবাসীদের সম্মতির অধিকারকে অপসারণ করতে বিভিন্ন আইনে সংশোধনী আনা হয়েছে। তা প্রত্যাহার করতে হবে।

জাতীয় অরণ্য নীতি অরণ্যের বেসরকারিকরণের পক্ষে সওয়াল করছে। এই নীতি প্রত্যাহার করে তার বদলে আদিবাসীদের অধিকার সুরক্ষায় যথাযথ নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

তফসিলি আদিবাসী এবং অন্যান্য চিরায়ত অরণ্যবাসীদের (অরণ্যের অধিকারের স্বীকৃতি) আইন, ২০০৬ পূর্ণ মাত্রায় রূপায়ণ করতে হবে। এই আইনে সংশোধনী এনে ১৯৮০-কে কাট অফ বছর ধরে অন্যান্য অরণ্যবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, আদিবাসীদের বাসভূমি থেকে তাদের উচ্ছেদ করা যাবে না।

আদিবাসীরা যে ক্ষুদ্র অরণ্য সম্পদ সংগ্রহ করেন তার ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করা, আদিবাসী মহিলাদের অধিকারের সুরক্ষা।

অরণ্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ সংক্রান্ত নিয়ম ও সরকারি নির্দেশিকায় এমন সংশোধনী আনা হয়েছে যা গ্রামসভার পরিধির মধ্যে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারকে খর্ব করছে। এইসব সংশোধনী প্রত্যাহার করতে হবে।

পেসা ও পঞ্চম তফসিলের অধিকার সুরক্ষিত করতে হবে। আদিবাসী ভাষা ও লিপির স্বীকৃতি, সুরক্ষা ও উন্নয়ন ঘটাতে হবে। ভিল্লি, গোনডি, ককবরকের মতো ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আদিবাসীদের ভাষাকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে রাজ্যের সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দিতে হবে।

রাজ্য সরকারের ডমিসাইল তালিকায় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাদের আদিবাসী পরিচিতি ও অধিকারসহ তা করতে হবে। এক্ষেত্রে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে তাদের পরিযান নির্বিশেষেই তা করতে হবে।

সমস্ত আদিবাসীকে খাদ্য নিরাপত্তা আইনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

আদিবাসী ছাত্রদের বৃত্তি বাড়াতে হবে এবং আদিবাসী হস্টেলের মানোন্নয়নে সময়সীমা ভিত্তিক অডিট করাতে হবে।

সংখ্যালঘু

সিপিআই(এম)-র অবস্থান:

সংখ্যালঘু কমিশনকে বিধিবদ্ধ সংস্থার মর্যাদা দিতে হবে; তাদের হাতে বর্ধিত ক্ষমতা ও বর্ধিত পরিধি দিতে হবে, চেয়ারপার্সন ও সদস্যদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে।

সাচার কমিটির সুপারিশ প্রয়োগের জন্য ট্রাইবাল সাব প্ল্যানের মতো মুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্য সাব প্ল্যান তৈরি করতে হবে; সংখ্যালঘু এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচিকে শক্তিশালী করতে হবে; এই কর্মসূচিকে সংশোধন করতে হবে যাতে কর্মসংস্থান, শিক্ষা,

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বর্ধিত বরাদ্দ ও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া যায়, বিশেষ করে যেসব জেলায় মুসলিম জনসংখ্যার আধিক্য রয়েছে।

খ্রিস্টানসহ সংখ্যালঘুদের ওপরে ক্রমাগত আক্রমণ মোকাবিলায় 'সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ মোকাবিলা আইন প্রণয়ন করতে হবে।

রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের রিপোর্টের সুপারিশ রূপায়ণ করতে হবে। আশু পদক্ষেপ হিসাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ওবিসি মুসলিমদের নির্দিষ্ট রাজ্যভিত্তিক ওবিসি কোটায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ব্যাঙ্কের অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ঋণের ১৫ শতাংশ মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে; স্বনিযুক্ত মুসলিম যুবকদের জন্য ভরতুকিতে ঋণ দিতে হবে।

মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে; মুসলিম ছাত্রীদের জন্য হস্টেল ও বৃত্তি উল্লেযোগ্যভাবে বাড়াতে হবে।

স্কুলে উর্দু পঠনপাঠনকে উৎসাহ দিতে হবে; উর্দুতে উন্নত গুণমানের পাঠ্যবই প্রকাশ করতে হবে, উর্দু শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।

সন্ত্রাসের মামলায় মুক্ত সমস্ত মুসলিমদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন দিতে হবে, মিথ্যা মামলায় তাঁদের অভিযুক্ত করা ও অত্যাচার চালানোর জন্য দায়ী অফিসারদের শাস্তি দিতে হবে; এই সমস্ত মামলার জন্য ফাস্ট ট্র্যাক আদালত তৈরি করতে হবে।

গণপ্রহারে নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

অন্যান্য অনগ্রসর অংশ

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণকে যথাযথভাবে রূপায়ণ করতে হবে; সমস্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওবিসি সংরক্ষণ চালু করতে হবে।

অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জাতীয় কমিশনকে শক্তিশালী করতে হবে।

ওবিসি শংসাপত্র দেবার পদ্ধতির সরলীকরণ করতে হবে।

এসসি, এসটিদের মতো অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর অংশের ওবিসিদের জন্য কর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণের সার্বিক প্যাকেজ তৈরি করতে হবে।

এলজিবিটিকিউ+

ট্রান্সজেন্ডার পার্সনস (অধিকার রক্ষা) আইন, ২০১৯ সম্পর্কে এই অংশের মধ্যে যে উদ্বেগ রয়েছে তা বিবেচনায় রেখে সংশোধনী।

সম লিঙ্গের দম্পতিদের আইনি স্বীকৃতি যেমন সিভিল ইউনিয়ন বা সেম সেক্স পার্টনারশিপের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। বিশেষ বিবাহ আইন ১৯৫৪-র মতো একই ধারায় আইন করা যাতে সঙ্গী নির্ভরশীল হিসাবে বা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পায়, বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে খোরপোষ পায়।

এলজিবিটিকিউ+অংশের বিরুদ্ধে বৈষম্য অবসানে সার্বিক বিল।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ, নিয়োগে আনুভূমিক সংরক্ষণ।

এলজিবিটিকিউ+ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ অন্যান্য সব অংশের বিরুদ্ধে অপরাধের সমতুল বিবেচনা করতে হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথাগত লিঙ্গ অনুসারী না হওয়া এবং এলজিবিটিকিউ+ছাত্র, শিক্ষক, কর্মীদের হয়রানি, হেনস্তা ও তাদের বিরুদ্ধে হিংসার মোকাবিলা করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। ইউজিসি-র র‍্যাগিং বিরোধী নীতি সংশোধনী (২০১৬) রূপায়ণ করতে হবে যেখানে লিঙ্গ পরিচিতি বা লিঙ্গ পছন্দের ফলাফলে র‍্যাগিং বন্ধ করার কথা বলা রয়েছে, ট্রান্স, ইন্টারসেক্স, জেন্ডার নন কনফর্মিংদের জন্য ব্যবহারযোগ্য নিরাপদ শিচালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

তাঁদের সম্মতি ব্যতীত এলজিবিটিকিউ+-দের লিঙ্গ পরিবর্তনের অস্ত্রোপচার করা যাবে না।

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে

সিপিআই(এম)-র অবস্থান :

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের বিষয় বিভিন্ন ক্ষেত্রের, এই স্বীকৃতি দিয়ে আরপিডি আইন ২০১৬-র লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচিকে নতুন করে সাজাতে হবে।

জেন্ডার বাজেটিংয়ের মতো ডিসএবিলিটি বাজেটিং করতে হবে, মন্ত্রগুলির বাজেটের ৫ শতাংশ বরাদ্দ প্রতিবন্ধীদের জন্য চিহ্নিত করতে হবে, আরপিডি আইন ও মানসিক স্বাস্থ্য আইনের বিভিন্ন ধারা রূপায়ণে বর্ধিত বরাদ্দ চাই।

আরপিডি আইনে সহজগম্যতার যে কথা বলা রয়েছে তা মান্য করতে হবে।

সহায়তা ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের ওপর থেকে জিএসটি প্রত্যাহার করতে হবে।

শংসাপত্র দেবার পদ্ধতি সরলীকরণ করা, শংসাপত্র দ্রুত দেওয়া ও ইউডিআইডি কার্ড সব জায়গায় বৈধ বলে স্বীকৃতি।

বেসরকারি ক্ষেত্রে শিক্ষা ও নিয়োগে সংরক্ষণ প্রসারিত করা, শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করা।

ন্যূনতম ৬ হাজার টাকা প্রতিবন্ধী পেনশনকে রাজ্যের ন্যূনতম মজুরি ও জীবনধারণের খরচের সঙ্গে সংযুক্ত করা। কেয়ারগিভার ভাতা চালু করে সমপরিমাণ টাকা তাদের দেওয়া, সমস্ত প্রতিবন্ধীদের অন্ত্যোদয় যোজনার কার্ড দেওয়া, সমস্ত প্রতিবন্ধীর সার্বজনীন বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া।

প্রতিবন্ধী মহিলাদের জীবিকা ও আবাসের সুযোগ দেওয়া, সেই সঙ্গে তাদের যৌন ও প্রজননের অধিকারকে সহায়তা করা।

সংবিধানের ১৫ ও ১৬ নম্বর ধারায় বৈষম্য প্রতিরোধের ক্ষেত্রে 'প্রতিবন্ধকতাযুক্ত'-কে অন্তর্ভুক্ত করা। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের অধিকার সংক্রান্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের কনভেনশনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমস্ত আইনকে সমন্বিত করা।

জনগণের কল্যাণের জন্য শিক্ষা

সিপিআই(এম) যে কাজ করবে:

– জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০২০-র রূপায়ন বন্ধ কর। বাণিজ্যিকীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ, কেন্দ্রীকরণ চলবে না।

- জিডিপি'র ৬ শতাংশ সরকারি শিক্ষাখাতে ব্যয় করতে হবে।
- শিক্ষায় ও পাঠ্যবইয়ে সাম্প্রদায়িক উপাদান অপসারণ, রাষ্ট্রীয় সহায়তাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠানে উপাচার্য বা গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীর ধর্মনিরপেক্ষতা-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি রাখা চলবে না।
- বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদ, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ, ইউজিসি, এনসিইআরটি-র মতো প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের একমাত্র বিচার্য হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত দক্ষতা। সিলেবাসের সাম্প্রদায়িকীকরণের অবসানে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পর্যালোচনা কমিটি হবে।
- অভিন্ন স্কুল শিক্ষা কাঠামো তৈরি করা হবে; সরকারি স্কুল বন্ধ করা বা একত্রে মিশিয়ে দেওয়া বন্ধ, কেরালা মডেলে সরকারি স্কুলকে উন্নত করা, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতকে ২০:১-এ নামিয়ে আনা হবে।
- বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিক্ষার অধিকার আইন রূপায়ণ; নেবারহুড স্কুলিংয়ের ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে শিক্ষার অধিকার আইন সংশোধন, তাকে প্রাথমিকের পরেও সম্প্রসারিত করা, সমস্ত পড়ুয়াকে বিনা খরচে শিক্ষা দেওয়া, সমস্ত স্কুল যাতে আরটিই মেনে চলে তা নিশ্চিত করা।
- ড্রপ আউট কমানো ও সার্বজনীন রূপ দেবার জন্য মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার প্রসার ঘটানো, এসএসএ স্কুলে শিক্ষার উৎকর্ষতা ও পরিকাঠামো উন্নত করা; ছাত্রীদের এবং অনগ্রসর এলাকা ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর পড়ুয়াদের পড়াশোনা অব্যাহত রাখতে বিধির নমনীয়তা, সময়, ও অন্যান্য বিষয় স্থির করতে হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ক্যাম্পাসে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে জেন্ডার সেন্সিটাইজেশন কমিটি তৈরি।
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন, ভর্তি ও পাঠক্রম নিয়ন্ত্রণ করতে আইন চালু।
- উচ্চশিক্ষায় এফডিআই চলবে না।
- শিক্ষার সর্বস্তরে বৈজ্ঞানিক, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক পাঠ্যক্রম এমন ভাবে তৈরি করা যা ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেয়।
- চুক্তিতে নিযুক্ত বা প্যারা টিচারদের নিয়মিতকরণ।
- সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে নিশ্চিত করা; সমস্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন বাধ্যতামূলক করা।
- উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের স্বশাসনের ওপরে আক্রমণ বন্ধ করা।
- উচ্চশিক্ষায় সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধি।
- প্রান্তিক অংশের ছাত্রদের জন্য বিদেশি বৃত্তি পুনরায় চালু করা।
- দলিত ও আদিবাসী ছাত্রদের সহায়তা করে রোহিত আইন চালু করা, ছাত্রদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য শিবির ও হেল্পলাইন চালু করা।

- কেন্দ্রে এবং রাজ্য স্তরে বিনামূল্যে চিকিৎসার অধিকারকে বিচারযোগ্য অধিকারে পরিণত করতে যথাযথ আইন।
- যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে রাজ্য তালিকাতেই রাখতে হবে।
- স্বাস্থ্য খাতে সরকারি বরাদ্দ জিডিপি'র ৫ শতাংশ করতে হবে, অন্তত ২ শতাংশ দেবে কেন্দ্র।
- মোট চিকিৎসা খরচে নাগরিকদের নিজস্ব খরচের পরিমাণ ২৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনতে হবে; সব স্তরে উৎকর্ষ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রসার, এর মধ্যে ওষুধ, পরীক্ষা, ভ্যাকসিনকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় মানুষের কাছে দায়বদ্ধতা থাকতে হবে।
- সরকারি অর্থে পিএমজেএওয়াই/ আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প বাতিল করে তার বদলে সরকার-কেন্দ্রিক সার্বজনীন চিকিৎসা প্রকল্প চালু করতে হবে।
- চিকিৎসা পরিষেবার বেসরকারিকরণ বন্ধ করতে হবে, পিপিপি'র মাধ্যমে পরিষেবার আউটসোর্সিং বন্ধ করতে হবে।
- সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের সুরক্ষায় ইএসআই-কে প্রসারিত ও তার সংস্কার করতে হবে, পেশাগত স্বাস্থ্য সমস্যাকেও এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- বেসরকারি চিকিৎসা ক্ষেত্রকে কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, বিশেষ করে কর্পোরেট হাসপাতালগুলিকে। তাদের ক্লিনিকাল এস্টাব্লিশমেন্ট আইনের অধীনে আনতে হবে। ন্যাশনাল ক্লিনিকাল এস্টাব্লিশমেন্ট আইন, ২০১০-কে পরিবর্তন করে রোগীদের অধিকারের সনদ রূপায়ণ করতে হবে, ন্যায়সঙ্গত হার ও বিভিন্ন পরিষেবার গুণগত মান কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে।
- মানসিক অসুস্থতায় ভোগা ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও যত্নের জন্য অধিকার ভিত্তিক সার্বিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সংশোধিত জেলা মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।
- জনগণের স্বার্থবাহী জাতীয় ওষুধ নীতি গ্রহণ, যেখানে খরচ ভিত্তিক মূল্য নিয়ন্ত্রণ থাকবে, অযৌক্তিক ও বিপজ্জনক ফর্মূলেশন বাতিল করা হবে, সার্বিক জেনেরিক ওষুধের নীতি গ্রহণ করা হবে। লেবেলিং, প্রেসক্রিপশন, খুচরো দোকানে পাওয়া যাবে এমন ব্যবস্থা করতে হবে; সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে জরুরী ওষুধ বিনামূল্যে পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ওষুধের বহুজাতিক সংস্থাগুলির একচেটিয়া আধিপত্য ভেঙে দেবার উদ্যোগ নিতে হবে।
- প্রয়োজনীয় ওষুধ ও ভ্যাকসিন উৎপাদনের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ওষুধ কোম্পানিগুলির পুনরুজ্জীবন, বেসরকারিকরণের প্রবণতা বিপরীতমুখী করা, ওপেন সোর্স ড্রাগ ডিসকভারি কর্মসূচি আবার চালু করা, ওষুধ সাধ্যের মধ্যে পাওয়ার জন্য গবেষণা ও

উন্নতির কাজ করা, জীবনদায়ী ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওষুধে জিএসটি প্রত্যাহার।

- ক্লিনিকাল ট্রায়াল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, অনৈতিক ট্রায়াল নিষিদ্ধ করতে হবে, ক্লিনিকাল ট্রায়ালে অংশগ্রহণকারীদের জন্য অধিকার সম্বলিত এবং বিচারযোগ্য সনদ তৈরি করতে হবে।
- ভারতের পেটেন্ট আইন শিথিল করা চলবে না, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির যেসব ধারায় দেশে কম দামে জেনেরিক ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে, তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে।
- আয়ুশ ওষুধের ক্ষেত্রে কার্যকরী নজরদারি চাই, এইসব পদ্ধতির প্রমাণ-ভিত্তিক ব্যবহারকে সমর্থন করেই তা করতে হবে।
- যেখানে কম আছে, যেমন উত্তর পূর্ব বা দরিদ্রতর রাজ্যগুলিতে চিকিৎসক ও নার্স তৈরির জন্য নতুন সরকারি কলেজে অগ্রাধিকার দিতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে।
- ওষুধের বিপণনের ক্ষেত্রে এথিক্যাল কোড বাধ্যতামূলক করা।

কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা

- সমস্ত শহর এলাকার জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চয়তার আইন চালু করা।
- রেগায় ২০০দিন কাজের নিশ্চয়তা চাই; রেগায় কাজের পরিধির মধ্যে এমন সমস্ত কাজে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা গ্রামীণ এলাকায় জীবনমানের উন্নতি ঘটায়, অ্যাপ-ভিত্তিক অ্যাটেনডেন্স পদ্ধতি প্রত্যাহার।
- কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য শ্রমনিবিড় শিল্পের জন্য বিশেষ প্যাকেজ।
- শ্রমনিবিড় সংস্থা গড়ে তোলায় উৎসাহ দেওয়া, সংশ্লিষ্ট সংস্থায় কর্মসংস্থানের সঙ্গে নিয়োগকর্তাদের আর্থিক সহায়তা, ইনসেনটিভ, ছাড়কে যুক্ত করা।
- সরকারি দপ্তরে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ, নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, বছরে ৩ শতাংশ সরকারি পদ বিলুপ্তির আদেশ প্রত্যাহার, বকেয়া পদ পূরণ করা।

প্রবীণ নাগরিক

- প্রবীণ নাগরিকদের সম্ভ্রমের সঙ্গে জীবনযাপনের লক্ষ্যে অবিলম্বে সরকারি বরাদ্দে সার্বজনীন এবং নন কনট্রিবিউটরি বার্ধক্য, পেনশন ব্যবস্থা চালু করা যেখানে ন্যূনতম মাসিক পেনশন হবে ন্যূনতম মজুরির অন্তত ৫০ শতাংশ বা মাসিক ৬ হাজার টাকার মধ্যে যেটি বেশি হবে। যাঁরা আয়করদাতা অথবা যাঁরা অন্য কোনো সূত্র থেকে এর বেশি পেনশন পাচ্ছেন তাঁদের বাদ দিয়ে সব ভারতীয় নাগরিকের জন্য এটি ব্যক্তিগত অধিকার হিসাবে স্বীকৃত হবে।
- স্বয়ংক্রিয় ভাবেই পেনশনকে ক্রেতা মূল্যসূচকের সঙ্গে যুক্ত করে বার্ষিক সংশোধন করতে হবে।
- বৃদ্ধাবাস, ডে কেয়ার কেন্দ্র, অসুস্থদের যত্ন নেবার কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে সরকারি সহায়তায়, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার চিকিৎসায় আরো জোর দিতে হবে।

প্রাক্তন সেনাকর্মী

- এক পদ এক পেনশন পূর্ণ ভাবে রূপায়ণ করা, সশস্ত্র বাহিনীর কর্মীদের আঘাতজনিত পেনশন এবং প্রতিবন্ধকতার ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত নতুন নিয়ম সম্পর্কে যে উদ্বেগ রয়েছে তার নিষ্পত্তি করা।
- অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর কর্মীদের, বিধবা ও নির্ভরশীল ব্যক্তিদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে, সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমতুল বিবেচনা করতে হবে।
- প্রাক্তন সেনাকর্মীদের বিষয়ে এবং তাঁদের যে ক্ষোভ রয়েছে তা নিষ্পত্তি করতে প্রাক্তন সেনা অফিসারের নেতৃত্বে কমিশন গঠন।

নগর সংক্রান্ত বিষয়

দ্রুত নগরায়ন ও অসম উন্নয়নের প্রেক্ষিতে সিপিআই(এম) চায় :

- শহর এলাকায় ইনফর্মাল ও অসংগঠিত শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা।
- পানীয় জল, নিকাশি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য জরুরী সরকারি পরিষেবার বেসরকারিকরণ বন্ধ করা।
- বস্তি উচ্ছেদের অভিযান বন্ধ করা। বস্তি এলাকাতেই মৌলিক সুযোগের উন্নয়ন।
- সরকারি আবাসন, সরকারি পরিবহন ও পার্কের প্রসার।
- দূষণ ও পরিবেশের অবনতি মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- নতুন নগর নীতি তৈরি করা যা বেসরকারি রিয়েল এস্টেট ব্যবসার স্বার্থের বদলে সাধারণ মানুষের কল্যাণে অগ্রাধিকার দেবে।
- ৭৪তম সংবিধান সংশোধনীকে জোরদার করে শহরের স্থানীয় সংস্থার হাতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।
- সরকার থেকে স্থানীয় সংস্থাকে যথেষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ যাতে তারা যথাযথভাবে আবাস, জল, নিকাশির ব্যবস্থা করতে পারে।

পরিবেশ

- পরিবেশে প্রভাবের মূল্যায়ণের ব্যবস্থা ও পদ্ধতি, পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে কার্যকরী, সময়সীমা ভিত্তিক, স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ, এবং স্বার্থের সংঘাতমুক্ত করতে হবে। ইআইএ নোটিফিকেশন ২০২০ বাতিল করে সংশোধিত নির্দেশিকা দিতে হবে।
- গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমিয়ে আনতে সমগ্র অর্থনীতি ধরে পরিকল্পনা করতে হবে, ফসিল জ্বালানি থেকে রূপান্তর করতে হবে বিবেচনা প্রসূতভাবে, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি যেমন সৌর ও বাতাসকে ব্যবহার করায় উদ্যোগ নিতে হবে।
- জলবায়ুর ওপরে যে প্রভাব পড়ছে যেমন কৃষিক্ষেত্রে, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, ধস, শহরে বন্যা, দাবদাহ, শহরে অতিরিক্ত তাপপ্রবাহের এলাকা তৈরি হয়ে যাওয়া, উপকূলের ভাঙন, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি তা নিয়ে রাজ্যগুলিসহ সমস্ত প্রভাবিতদের অংশগ্রহণের

মাধ্যমে ন্যাশনাল অ্যাডাপশান প্ল্যান তৈরি করতে হবে।

- ভঙ্গুর হিমালয় এলাকা, পরিবেশের দিক থেকে স্পর্শকাতর পশ্চিমঘাট ও উত্তর পূর্বের জন্য দীর্ঘস্থায়ী, পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়নের পথ নিতে হবে।
- নগর এলাকায় বায়ুদূষণ মোকাবিলায় দ্রুত ও লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্রোগ্রামকে সামগ্রিক ভাবে সংশোধন করতে হবে।
- শহর এলাকা সহ নদীখাত, বন্যার সমতলভূমির দ্রুত অবনতি এবং ধ্বংসাত্মক উন্নয়ন রুখতে জরুরী ব্যবস্থা।
- জীববৈচিত্র্য সংশোধন আইন ২০২৩-এর সেইসব ধারা প্রত্যাহার করতে হবে যা জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জ্ঞান কর্পোরেটের হাতে হস্তান্তরিত করে দিচ্ছে।
- আন্দামান নিকোবর, লাক্ষাদ্বীপের পরিবেশগত ভাবে সর্বনাশা কর্পোরেট স্বার্থবাহী দ্বীপ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে, আন্দামান নিকোবরে প্রস্তাবিত নৌঘাঁটির বাস্তবতা ও অবস্থান পুনরায় পরীক্ষা করতে হবে।
- পরিবেশগতভাবে বিপজ্জনক ন্যাশনাল অয়েল পাম মিশন বাতিল কর। এর ফসল সম্পর্কে অত্যন্ত বাড়িয়ে বলা হচ্ছে, পরিবেশগতভাবে স্পর্শকাতর উত্তর-পূর্ব ও আন্দামানে এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে।

জলসম্পদ

- জলকে দামী জনসম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করে জাতীয় জল নীতি নতুন করে প্রণয়ন করতে হবে। ক্রমবর্ধমান জলসঙ্কটের মোকাবিলা করতে হবে, গার্হস্থ্য কারণে প্রয়োজনীয়, সেচ ও শিল্পের প্রয়োজনে জলের সমতামূলক যোগান দিতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন নদীর কার্যকরী সুরক্ষা, জলাশয়ের সম্প্রসারণ, ভূগর্ভস্থ জলকে নতুন করে বাড়ানো, যথাযথ আইন, কার্যকর নিয়ন্ত্রণ এবং চাহিদার সুবিন্যস্ত তত্ত্বাবধান। বিশেষ করে শহর এলাকায় জলের অডিট, সংরক্ষণ, পরিশোধন, রিসাইকেল প্রয়োজন।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মাপকাঠি অনুযায়ী নলবাহিত পানীয় জল সব বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে।
- জলসম্পদের এবং শহর এলাকায় জলের বণ্টনের বেসরকারিকরণ বন্ধ করতে হবে, জলের অধিকার জীবনের অধিকারের অঙ্গ এই বোঝাপড়াকে স্বীকৃতি দিতে হবে।
- নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের দূষণ আটকাতে আইন, বর্জ্য ও নিকাশির ক্ষেত্রে জলের পরিশোধন ও রিসাইক্লিং নীতি দরকার। রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের মাথার ওপর দিয়ে কেন্দ্রকে জল (দূষণ মোকাবিলা ও নিয়ন্ত্রণ) সংশোধনী, ২০২৪-এ যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা প্রত্যাহার করতে হবে।
- নদীগুলির সংযোগের কর্মসূচির সামগ্রিক পর্যালোচনা করতে হবে।
- প্রধান নদীগুলির অববাহিকা রক্ষা করতে, বিশেষ করে হিমালয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে, হিমবাহ গলন আটকাতে সম্ভাব্য সমস্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

- দেশীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় সরকারি বরাদ্দ অন্তত জিডিপি'র ২ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে। মৌলিক গবেষণায় যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।
- গবেষণা ও উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতিকে জোরদার করতে হবে; গবেষণার ফেলোশিপের সংখ্যা বাড়াতে হবে; প্রতিষ্ঠানগুলিতে ফ্যাকাল্টি রিসার্চ পদের সংখ্যা বাড়াতে হবে, পিএইচডি'র সংখ্যা ও গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে।
- গবেষণার জন্য অর্থবরাদ্দের পদ্ধতির বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে; নতুন শিক্ষানীতিতে অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত জাতীয় গবেষণা ফাউন্ডেশন বাতিল করতে হবে।
- অনেক সরকারি বরাদ্দকৃত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে হবে। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসকে পুনর্গঠন করে সরকারি বরাদ্দ পুনরায় চালু করতে হবে।
- জনগণের সমস্যা যেমন খরা, জলসম্পদ পরিচালনা, গ্রামীণ জীবন-জীবিকা, প্রান্তিক মানুষের সমস্যা তার মোকাবিলায় বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য রাজ্যস্তরে উদ্যোগ নিতে বরাদ্দ স্থির করা।
- 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লব'-এ চিহ্নিত ক্ষেত্রের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। যেমন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অফ থিঙস, বায়ো ও ন্যানো প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে। বহুজাতিকদের একচেটিয়া ভাঙতে ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সক্ষম কৃষি ও উদ্যান গড়ে তুলতে কৃষি গবেষণায় জোর দেওয়া।
- বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং, গণিত ক্ষেত্রে গবেষণা ও কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে ধারাবাহিক পদক্ষেপ, মগজ চালান রুখতে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও গবেষণার সংস্কৃতিকে উৎসাহ প্রদান।
- জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর হয় এমনভাবে এআই, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ডেটা-মাইনিং, তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক নজরদারিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- সংবিধান যেভাবে বলেছে তেমন ভাবেই বিজ্ঞানমনস্কতা, অনুসন্ধানের মানসিকতা, সংস্কারকে উৎসাহ দেওয়া; স্বাধীন পরামর্শদাতা সংস্থা-সহ বিজ্ঞান প্রসারকে পুনরায় চালু করা; তারা বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করা ও বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার কাজ করবে।
- মুক্ত এবং ওপেন সোর্স সফটওয়ার এবং অন্যান্য নতুন প্রযুক্তিকে উৎসাহ দিতে হবে; কপিরাইট বা পেটেন্টের মাধ্যমে একচেটিয়া মালিকানা থেকে মুক্ত করতে হবে; 'সকলের জন্য জ্ঞান' প্রসারিত করতে হবে বিশেষত বায়োটেকনোলজি, এআই, ওষুধ আবিষ্কারের মতো ক্ষেত্রে।
- ডিজিটাল পরিকাঠামোকে সরকারি পরিকাঠামো হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে জনকল্যাণে ব্যবহার করতে হবে।
- সরকারি যোগাযোগ নেটওয়ার্কে বিনিয়োগ কর, কপিরাইটের বাধা কাটিয়ে বিজ্ঞান

ও অন্যান্য শিক্ষাগত প্রকাশনার মুক্ত ব্যবহারের সুযোগ উন্মোচিত কর, সরকারি বরাদ্দের গবেষণাকে সকলের জন্য ব্যবহারযোগ্য করতে হবে।

নজরদারি ও ব্যক্তিগত পরিসরের প্রশ্ন

- ঘোষিত ও নির্দিষ্ট ওয়ারেন্ট ছাড়া এবং কঠোরভাবে বিচারবিভাগীয় তত্ত্বাবধান ছাড়া রাষ্ট্রীয় সংস্থার সমস্ত ধরনের ডিজিটাল নজরদারি বন্ধ করতে হবে; নাগরিকদের ফোন, কম্পিউটার, অন্যান্য ডিজিটাল যন্ত্রে ম্যালওয়্যার, হ্যাকিং, পেগাসাসের মতো নজরদারির প্রযুক্তি ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।
- ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন আইন, ২০২৩ বাতিল কর। এই আইনে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিকে নাগরিকদের ওপরে নজরদারির বিপুল ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ডিজিটাল স্বৈরতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য। তাছাড়াও এই আইনে নাগরিকদের তথ্য নিজেদের মুনাফার স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য বৃহৎ ব্যবসায়ীদের যথেচ্ছ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।
- সুপ্রিম কোর্টের পুত্তুস্বামী রায়ে বলা হয়েছে ব্যক্তিগত পরিসর মৌলিক অধিকার। এই রায়কে বিচারযোগ্য কাঠামো দিতে নতুন আইন চাই। নাগরিকদের ব্যক্তিগত পরিসরের অধিকার সরকার বা বেসরকারি বাণিজ্য লঙ্ঘন করছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা গঠনে নতুন আইন চাই।
- টেলিকম এবং ডিজিটাল একচেটিয়া কার্যকরীভাবে খর্ব ও নিয়ন্ত্রণ করতে কম্পিটিশন কমিশনকে শক্তিশালী করতে হবে।
- টেলিযোগাযোগ আইন, ২০২৩-এ নজরদারি, আড়িপাতা, ইন্টারনেট শাটডাউন, এনক্রিপটেড পরিষেবা খর্ব করা, সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের কেওয়াইসি সহ দানবীয় ব্যবস্থা রয়েছে। এইসব ধারাকে বাতিল করতে হবে।
- আইটি সংশোধনী বিধি, ২০২৩-এ সরকারকে ফ্যাক্ট চেক ইউনিট তৈরির মাধ্যমে পূর্ণ সেন্সরশিপের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই কাজ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের একচ্ছত্র নির্দেশে এবং অনলাইন সমালোচনাকে আক্রমণ করার লক্ষ্যে। এই দানবীয় বিধি প্রত্যাহার করতে হবে।

সংস্কৃতি ও মিডিয়া

- সংবিধানের অষ্টম তফসিলে তালিকাভুক্ত সমস্ত ভাষাকে সমান ভাবে উৎসাহ দিতে হবে; হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।
- ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে উৎসাহ দেওয়া; সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সৃষ্টির ওপরে সাম্প্রদায়িক শক্তির আক্রমণের কড়া হাতে মোকাবিলা করা হবে।
- হিংসাকে গৌরবান্বিত করা এবং মহিলাদের, যৌনতাকে পণ্যায়িত করা খর্ব করা হবে।
- ইন্টারনেট পরিচালনাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যথাযথ আন্তর্জাতিক সংস্থার দায়িত্বে নিয়ে আসতে হবে। জনগণ-কেন্দ্রিক ইন্টারনেট তৈরি করতে হবে যা

সামাজিক ন্যায়বিচারের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ও আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনগুলির নিয়ন্ত্রণমুক্ত, এমন এক বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা ব্যক্তিগত পরিসরের অধিকারকে রক্ষা করে এবং কোনো সরকারের গণ নজরদারির অনুমোদন দেয় না।

- ভুয়ো খবরের প্রসার নিয়ন্ত্রণ করতে পদক্ষেপ এবং যেসব গোষ্ঠী বা ব্যক্তি তা ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।
- স্বেচ্ছাচারী গ্রেপ্তারি ও অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা থেকে সাংবাদিকদের সুরক্ষার আইন প্রণয়ন।
- সমবায়ভিত্তিক ও কালেকটিভ মিডিয়া সংস্থাকে উৎসাহ দেওয়া যাতে তথ্যের মুক্ত চলাচল থাকে; প্রসার ভারতী কর্পোরেশনকে প্রকৃতই গণ সম্প্রচার পরিষেবা হিসাবে শক্তিশালী করা।
- মিডিয়ায় একচেটিয়া ও শিখন্ডি কোম্পানিগুলির নিয়ন্ত্রণ মোকাবিলায় ক্রস মিডিয়া মালিকানা নিয়ন্ত্রণ। মুদ্রণ, ডিজিটাল, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করা হবে।
- মুদ্রণ, বৈদ্যুতিন এবং ডিজিটাল মিডিয়ার জন্য একটি অভিন্ন মিডিয়া কাউন্সিল গঠিত হবে যেখানে মিডিয়া, মিডিয়ার ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা এবং স্বাধীন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা থাকবেন; সাংবাদিকদের কাজের পরিবেশের অবনতি এবং বিশ্বায়নের সময় থেকে মিডিয়ায় নতুন প্রবণতা খতিয়ে দেখতে মিডিয়া কমিশন গঠন করা হবে।
- মুদ্রণ, ডিজিটাল ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের সম্মানজনক বেতন, কাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস আইন ফিরিয়ে আনা হবে, শক্তিশালী করা হবে। তিন মাধ্যমের জন্যই নতুন বেতন বোর্ড গঠন করা হবে।
- আইটি বিধিতে ২০২১-র সংশোধনী প্রত্যাহার করা হবে, রেজিস্ট্রেশন অফ প্রেস অ্যান্ড পিরিয়ডিকালস বিল ২০২২-র খসড়া পর্যালোচনা করা হবে। নতুন ব্রডকাস্টিং সার্ভিসেস (নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০২৩ বিবেচনাই করা হবে না।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

সিপিআই(এম) চায়:

- ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতার সুরক্ষা, বাকস্বাধীনতা মতপ্রকাশের অধিকার ও ব্যক্তিগত অধিকারের ওপরে অন্যায্য নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে এমন সমস্ত ধারার পর্যালোচনা ও সংস্কার।
- বিধিবদ্ধ, সাংবিধানিক, নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির স্বাধীনতা রক্ষা। সিভিসি, সিবিআই, নির্বাচন কমিশন, জাতীয়/রাজ্য মানবাধিকার কমিশন, লোকপাল, লোকায়ুক্ত, মহিলা কমিশন, এসটি-এসটি কমিশন প্রভৃতি সংস্থার নিয়োগে স্বচ্ছতা। সমস্ত ধরনের দুর্নীতি বিশেষ করে উচ্চপর্যায়ে দুর্নীতি বন্ধে ব্যবস্থা, যারা দুর্নীতির খবর দেবেন তাদের সুরক্ষা দেওয়া, অভিযোগের কার্যকরী ব্যবস্থা, দ্রুত ও সাধ্যের মধ্যে বিচার, নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং বর্ধিত দায়বদ্ধতা

- গত চার বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দাবি করা যায় লোকপালকে শক্তিশালী করা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে তাদের স্বাধীনতা দিতে হবে।
- কর্পোরেট অপরাধ বিশদে তদন্তের জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও তদন্তকারীদের ক্ষমতা দেওয়া।
- বেসরকারি আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্থা, ব্যাঙ্কিং ও বিমা ক্ষেত্রকে এবং সমস্ত পিপিপি প্রকল্পকে লোকপাল আইন। হুইসলব্লোয়ার প্রোটেকশন আইন এবং অন্যান্য দুর্নীতি-নিরোধক আইনের আওতায় আনতে হবে।
- আরটিআই ব্যবহারকারী এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে যাঁরা লড়ছেন তাঁদের সুরক্ষা দেবার কার্যকরী ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে; হুইসলব্লোয়ার প্রোটেকশন আইনকে কার্যকরী চেহারা দিতে সংশোধন করতে হবে।
- তথ্যের অধিকারের আইনকে শক্তিশালী করতে হবে; সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমস্ত প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে; আরটিআই আইনের ৪ নম্বর ধারাকে রূপায়ণ করতে হবে, কোনো আইন পাস করার আগে স্বচ্ছ পদ্ধতিতে নাগরিকদের কাছ থেকে অভিমত চাইতে হবে।
- সরকারি গোপনীয়তা আইনের অপব্যবহার বন্ধ করা ও ওই আইনকে যথাযোগ্যভাবে সংশোধন করা।

বিচারবিভাগীয় সংস্কার

- নিয়োগ, বদলি, বিচারপতিদের তরফে কোনো ভ্রান্ত পদক্ষেপ, বিচারবিভাগীয় দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে জাতীয় বিচারবিভাগীয় কমিশন তৈরি করতে হবে যেখানে বিচারবিভাগ, সরকার, আইনসভা, এবং বার-এর প্রতিনিধিরা থাকবেন।
- সাধারণ মানুষ যাতে সাধ্যের মধ্যে দ্রুত বিচার পান সেই লক্ষ্যে বিচারবিভাগের সংস্কার; বিচারবিভাগে শূন্যপদ পূরণ।
- ফৌজদারি অবমাননার সংজ্ঞা সংশোধন করা যাতে বিরোধী কণ্ঠস্বর দমনে তার অপব্যবহার না হয়।
- বিচারপতিদের সম্পত্তির প্রকাশ্য ঘোষণা বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- সব স্তরের বিচারবিভাগে বহুত্বের প্রতিনিধিত্ব রাখতে হবে।

নির্বাচন কমিশনে সংস্কার

- 'দি সিইসি অ্যান্ড আদার ইসি-স (নিয়োগ, কাজের শর্ত ও মেয়াদ) আইন, ২০২৩' সংশোধন করতে হবে। কমিশনের নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতিকে সুপারিশ করার কমিটিতে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি।
- নির্বাচন কমিশনাররা অবসরের পরে সরকারের কোন পদ, রাজ্যপাল অথবা আইনসভার সদস্য হতে পারবেন না।
- জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের সংশোধন করে নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের কাজের পরিধি নির্দিষ্ট করতে হবে।

নির্বাচনী সংস্কার

- আংশিক তালিকা ব্যবস্থা সহ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা চালু করা।
- স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের জন্য সামগ্রী দিয়ে রাষ্ট্রীয় সহায়তা, রাজনৈতিক দলকে কর্পোরেটের চাঁদা দেওয়া নিষিদ্ধ করা।
- গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা ফেরাতে ইভিএম ব্যবহারের বিধি সংশোধন করতে হবে। পোলিং বুথে ইলেকট্রনিক ইউনিটের পর্যায়ক্রম বদলাতে হবে– ভোটিং ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট এবং ভিভিপ্যাটের ক্ষেত্রে। ফল ঘোষণার আগে কন্ট্রোল ইউনিটে নথিভুক্ত ভোটের সঙ্গে অন্তত ৫০ শতাংশ ভিভিপ্যাট মেলাতে হবে।
- প্রার্থীদের মতো রাজনৈতিক দলেরও নির্বাচনী ব্যয়ের ঊর্ধ্বসীমা স্থির করে দিতে হবে। নির্বাচনী ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।